গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭২ বর্ষ ৩১ সংখ্যা | ১৩ - ১৯ মার্চ ২০২০ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

সোনার ভারত হয়ে গেছে এবার সোনার বাংলা

সোনা খেয়ে মানুষ বাঁচে বলে এখনও শোনা যায়নি। কিন্তু বাংলাকে সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়ার দাবি শুনে কেউ আপত্তি করেছে বলেও জানা নেই। মাঠে-ঘাটে সোনা পাওয়া গেলে অবশ্য তার দাম কতটা থাকবে, আর তা কী কাজে লাগবে? এসব নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ হতে পারে।

কিন্তু একটা বিষয়ে দ্বিমত নেই, ভোট কাছে এলেই নামী-দামি সব নেতাদের মুখে এই একটি স্লোগান বাংলার মানুষ শুনতে পাবেই— সোনার বাংলা গড়তে চান, অমুক দাদা বা দিদিকে ভোট দিন। একসময় কংগ্রেস বলেছে, তারপর বলেছে সিপিএম, তৃণমূলও কিছু কম সোনার দাবিদার ছিল না। তার সর্বাধুনিক সংযোজন করেছেন বিজেপির দুই নম্বর নেতা বলে খ্যাত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি ১ মার্চ কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে দাঁড়িয়ে বলে গেছেন ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে জেতাতে পারলেই সোনার বাংলা তাঁরা গড়ে দেবেন।

একটা প্রশ্ন অবশ্য উঠবে এর জন্য কাঁচামাল তাঁরা জোগাড় করবেন কোথা থেকে? বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি গোরুর দুধ থেকে সোনা নিষ্কাশনের নিদান দিলেও সে প্রযুক্তি সম্ভবত কেবল তাঁর দখলেই থেকে গেছে। অমিত শাহ পর্যন্ত তার নাগাল পাননি, না হলে নিশ্চয়ই এই উৎসটা অমিতজি রাজ্যের মানুষকে জানিয়ে যেতেন! তাহলে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি থেকেই কি আমদানি করা হবে সোনা? সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরম মিত্র মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারত সফরে আমেদাবাদের রাস্তায় ঝুপড়ি-বস্তি আড়াল করতে পাঁচিল তুলতে হয়েছে। সোনায় মোড়া গুজরাট দেখে বিদেশিদের লোভ হতে পারে এই অশঙ্কাতেই কি? যদিও নিন্দুকেরা বলছে পূতিগন্ধময় বস্তির কঙ্কাল ঢাকতেই নাকি পাঁচিল! কিন্তু অমিতজি মোদিজিদের

দুয়ের পাতায় দেখুন

দিল্লির সাম্প্রদায়িক হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের চিকিৎসা শিবির

উত্তর-পূর্ব দিল্লির শ্রীরাম কলোনিতে
এআইইউটিইউসি-র উদ্যোগে এমএসসি-এসডিএফের চিকিৎসা শিবির চলছে ৬ মার্চ থেকে

মহান কার্ল মার্কস স্মরণে

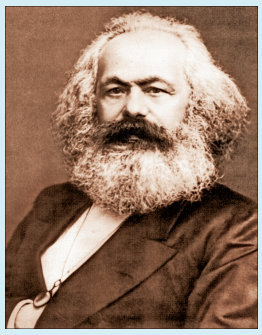

৫ মে ১৮১৮ - ১৪ মার্চ ১৮৮৩

"আমরা ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান চাই শুনে আপনারা আতঙ্কিত। অথচ আপনাদের বর্তমান সমাজে জনসমষ্টির শতকরা নব্বই জনের ক্ষেত্রেই তো ব্যক্তিগত মালিকানা ইতিমধ্যেই লোপ করা হয়েছে। অল্প কয়েকজনের ক্ষেত্রে সেটা আছে শুধু ওই দশ ভাগের নয় ভাগ লোকের হাতে নেই বলে। সুতরাং যে ধরনের মালিকানা বহাল থাকার অপরিহার্য শর্ত সমাজের বিপুল সংখ্যাধিক মানুষের কোনও সম্পত্তি না থাকা, সেই মালিকী ব্যবস্থা আমরা তুলে দিতে চাই, আপনাদের উচ্ছেদ চাই, এটাই আমাদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণির অভিযোগ। ঠিক তাই। আমাদের সংকল্প ঠিক তাই।"

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, ১৮৪৮

পি এফের সুদ কমানোর প্রতিবাদ
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদের হার কমিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৬ মার্চ এক বিবৃতিতে জানান,

'কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে সুদের হার কমিয়ে ৮.৫ শতাংশ করেছে। এ ব্যাপারে তারা ফান্ড ঘাটতির অজুহাত দেখিয়েছে। এর ফলে শ্রমজীবী জনগণের যতটুকু সামাজিক সুরক্ষা ছিল, তাতেও কোপ পড়ল। ব্যাঙ্কে জমানো টাকার সুদও ক্রমাগত কমানোর ফলে খেটে-খাওয়া দেশবাসীকে আরও সংকটের মধ্যে ফেলে দেওয়া হল।

অপরদিকে সরকার মালিক শ্রেণির হাতে অজস্র সুযোগ-সুবিধা তুলে দিচ্ছে। যেমন, 'ব্যবসায়ে স্বাচ্ছন্দ্য আনার নামে' তাদের বিপুল পরিমাণ ব্যাঙ্কঋণে ছাড় ও ঋণ-খেলাপিদের শাস্তি মকুব, সরকারি তহবিল তছরূপ করে বিপুল পরিমাণে কালো টাকা পুঞ্জীভূত করা এবং তা নিয়ে স্বচ্ছন্দে বিদেশে পালিয়ে যেতে দিচ্ছে। সর্বোপরি, শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড আত্মসাৎ করলেও মালিকদের রেহাই দিচ্ছে।

সমস্ত সম্পদের প্রকৃত স্রষ্টা শ্রমিক শ্রেণিকে এ ভাবে সর্বনাশের কিনারায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, অপরদিকে শোষক পুঁজিপতি শ্রেণির পরম হিতৈষী হিসাবে সরকার বলছে মালিকরাই 'সম্পদের স্রষ্টা', তাই তারা 'সম্মানের অধিকারী'। এই ঘটনা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছে বিজেপি সরকার কাদের অনুগত এবং কাদের জন্য 'আচ্ছে দিন' নিয়ে আসছে।

আমরা তাই দাবি করছি, প্রভিডেন্ট ফান্ডে সুদ কমানো সহ শ্রমিক বিরোধী সমস্ত সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। এই দাবি মানতে বাধ্য করার জন্য সকল শ্রমজীবী মানুষকে সঠিক নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দীর্ঘস্থায়ী শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।

আদিবাসী, বনবাসী মানুষদের অস্তিত্ব বিপন্ন

৩০ মার্চ পার্লামেন্ট অভিযান

জঙ্গলের অধিকার আইন-২০০৬-এর উপর সুপ্রিম কোর্টের ১৩ ফেব্রুয়ারির রায়ের ফলে লক্ষ লক্ষ আদিবাসী ও যুগ যুগ ধরে জঙ্গলে বসবাসকারী মানুষ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে জীবন জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়ে এক ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। অতীতে খনি, জলাধার, পথ নির্মাণ, জঙ্গল ও ভিটে-মাটি থেকে উৎখাত হওয়া প্রায় ২ কোটি আদিবাসী ও গরিব মানুষের সাথে এই উচ্ছেদের সংখ্যা যুক্ত করলে কী বিশাল অঙ্ক দাঁড়াবে তা অনুমান করাও দুরূহ। লক্ষণীয়, সাংবিধানিক রক্ষাকবচ হিসাবে রাজ্যে রাজ্যে জমির অধিকার রক্ষার আইন এবং ঝাড়খণ্ডে 'ছোটনাগপুর টেনান্সি অ্যাক্ট' ও 'সাঁওতাল পরগণা টেনান্সি অ্যাক্ট'-এর মতো আইন থাকা সত্ত্বেও গত এক দশকে এক কোটি চল্লিশ লক্ষের বেশি আদিবাসী ও গরিব মানুষ উচ্ছেদ হয়েছেন। গভীর উদ্বেগের বিষয়, অতি দ্রুত বিভিন্ন রাজ্যে এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এলাকায় এলাকায় আদিবাসী ও বনবাসীদের উচ্ছেদের নোটিস জারি করা চলছে এবং লক্ষ লক্ষ পরিবার চরম বিপদের সম্মুখীন। বংশ পরম্পরায় বসবাসকারী এই মানুষগুলি ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হলে জীবিকা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি হারিয়ে ছিন্নমূল হবেন।

আদিবাসী ও জঙ্গলে বসবাসকারী পরিবারগুলির একটা বড় অংশ জঙ্গলের উপর নির্ভর করে জীবন নির্বাহ করে। জঙ্গলে অবস্থিত গ্রামের বাইরে গঞ্জে বা শহরে উপার্জন করা তাঁদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। এই অবস্থায় জঙ্গল থেকে উচ্ছেদ করলে পথের ভিখারিতে পরিণত হওয়া ছাড়া এই বিশাল সংখ্যায় মানুষগুলির অন্য কোনও পথ থাকবে না।

আদিবাসী ও বনবাসীদের উচ্ছেদের এমন নির্দেশিকা এই প্রথম নয়। ২০০২ সালে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রক এক নির্দেশিকায় জঙ্গলের জমিতে বংশপরম্পরায় বসবাসকারীদের 'দখলকারী' অ্যাখ্যা দিয়ে তাঁদের উচ্ছেদের কথা বলেছিল। এর ফলে সেই সময় এক কোটির বেশি আদিবাসী ও চিরাচরিত বনবাসী মানুষের সামনে উচ্ছেদের বিপদ দেখা দিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই সেই নির্দেশিকার বিরুদ্ধে দেশের সমস্ত প্রান্তে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল। প্রতিবাদের মুখে পড়ে ২০০৩ সালে প্রাক্তন এক বিচারপতির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার ন্যাশনাল ফরেস্ট কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের সুপারিশক্রমে ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট-২০০৬ তৈরি হয়। আইনে বলা হয়, ১৩ নভেম্বর ২০০৫ অবধি যাঁরা জঙ্গলের জমিতে

দুয়ের পাতায় দেখুন

সোনার বাংলা

একের পাতার পর

সে কথায় কান দিলে কি চলে! যদিও বছর দুয়েক আগেও বিজেপির হাতে ছিল ২০টির বেশি রাজ্য। সেগুলি সোনায় মোড়ার ধাক্কায় সেই সংখ্যা কমে ১০-এর নিচে দাঁড়িয়েছে।

সোনায় মোড়া বিজেপি শাসনের দু'একটি হিসাব নেওয়া যাক। কিছুদিন আগে বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে ৩৬২ টি পিওনের পোস্টের জন্য আবেদন পড়েছিল ২৩ লক্ষ, তার মধ্যে ২৫৫ জন পিএইচ ডি ছাড়াও এম এ, এম এস সি এবং গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। কারণটা জানা যাবে উত্তরপ্রদেশের শ্রমমন্ত্রী স্বামী প্রসাদ মৌর্যের কথায়। ৭ ফেব্রুয়ারি তিনি জানিয়েছেন, উত্তরপ্রদেশের নথিভুক্ত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ৩৪ লক্ষ। যদিও বাস্তবে মোট বেকার বা অর্ধবেকার অর্থাৎ যাদের কোনও সুনির্দিষ্ট কাজ নেই, এমন মানুষের সংখ্যাটা যে কয়েক কোটি ছাড়াবে তাতে সন্দেহ নেই। বিজেপি কথিত হিন্দু কুলতিলক যোগী আদিত্যনাথের মুখ্যমন্ত্রীত্বে উত্তরপ্রদেশের বেকারত্বের হার বেড়েছে এক বছরে ৫৮ শতাংশ (বিজনেস টু-ডে, ২.০৩.২০২০)। সোনা কম পড়ার সম্ভাবনা নেই বোধহয়!

আরও কিছু সোনায় মোড়া বিজেপি রাজত্বের খবর নেওয়া যাক— ভারতবর্ষে যে ১০টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বেকারত্বের গড়ে সবচেয়ে এগিয়ে তার সবগুলিতে হয় বিজেপির সরকার চলছে, না হয় দু'দিন আগেও তাদের রাজ্য সরকার ছিল। শীর্ষে আছে ত্রিপুরা, তার বেকারত্বের হার ২৮.৬ শতাংশ, হরিয়ানাতে ২৭.৬ শতাংশ, হিমাচলপ্রদেশে ২০.২ শতাংশ। ঝাড়খণ্ডে এবং রাজস্থানে অল্পদিন আগেও ছিল বিজেপি সরকার, সেই দুই রাজ্যে বেকারত্বের হার যথাক্রমে ১৭.৭ এবং ১৫.৯ শতাংশ। বিহারে প্রায় ১২ শতাংশ, খোদ দিল্লিতে এই হার ১২ শতাংশের বেশি।

আর সারা দেশে? সাত সাতটা বছর তাঁরা যে কেন্দ্রীয়ভাবে সোনার চাষ করেছেন তা কেমন চকচক করছে? ইন্ডিয়ান লেবার বুরোর রিপোর্ট দেখাচ্ছে ভারতে লেবার পার্টিসিপেশন রেট ৪৯.৮ শতাংশ। অর্থাৎ ১৫ থেকে ৬০ বছর বয়সের মানুষ, যাঁরা সবচেয়ে কর্মক্ষম, তাঁদের অর্ধেকের বেশিরই কোনও কাজ নেই (ইকনমিক টাইমস, ০৪.০২.২০২০)। যত লোক কাজ করেন তার এক-তৃতীয়াংশই অস্থায়ী শ্রমিক। শ্রমিক-কর্মচারীদের ৮৩ শতাংশের সুনির্দিষ্ট বেতন বলে কিছু নেই। দেশের প্রতি তিনটি পরিবারের মধ্যে দুটিরই আয় মাসে ১০ হাজার টাকার নিচে (ব্লুমবার্গ ডটকম)। এই বাজারে তাতে পরিবার প্রতিপালন চলে? এমন সোনাতেই কি বিজেপি মুড়বে বাংলাকে?

সোনার রাজত্বে উত্তরপ্রদেশেই আখচাষিদের পাওনা প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা। বড় বড় মদের কোম্পানি এবং চিনিকল মালিকরা তা মেরে দিয়েছে। যোগী আদিত্যনাথের সরকারের যোগনিদ্রা ভঙেনি। সারা দেশে ১৮ হাজার ৯৫৮ কোটি টাকা চাষিদের দেয়নি এই কোম্পানিগুলি (বিজনেস লাইন ২১.০৬.২০১৯)। মহারাষ্ট্রে বিজেপি-শিবসেনা সরকার সদ্য গত হয়েছে। তাদের 'সোনার রাজ্য' গড়ার কারবারে সেখানে ৫ বছরে ঋণের জালে জড়িয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন ১৪ হাজার ৫০০ চাষি। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস বুরোর তথ্যে দেখা যাচ্ছে শুধু ২০১৬ সালে সারা দেশে ১১ হাজার ৩৭৯ জন চাষি আত্মহত্যা করেছেন। অর্থাৎ দিনে ৩১ জন চাষিকে ঋণের দায়ে আত্মঘাতী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে (দ্য ওয়্যার, ৮ নভেম্বর ২০১৯)। সোনার ভারতই বটে!

সোনার রাজত্বে 'বেটি পড়াও, বেটি বাঁচাও'-এর চিত্র কেমন? ২০১৮ সালে অ্যাসোসিয়েশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইটস দেখিয়েছে কমপক্ষে ১২ জন বিজেপি এমএলএ, এমপি ধর্ষণে অভিযুক্ত। ২০১৬ সালকে নারীদের জন্য সবচেয়ে ভয়াবহ বছর বলে চিহ্নিত করেছে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস বুরো। সরকারি হিসাবেই দিনে ১০৬ জন নারী ধর্ষিতা হয়েছেন সেই বছর। যদিও বাস্তব সংখ্যাটা আরও বহুগুণ বেশি তা মানুষ জানে। বিজেপির উত্তরপ্রদেশের এক মন্ত্রী বলেছেন, 'স্বয়ং রামচন্দ্রেরও ধর্ষণ আটকানোর ক্ষমতা নেই' (কোয়ার্জ ইন্ডিয়া ২৫.০৯.২০১৯)। সোনার রাজ্যই বটে! উত্তরপ্রদেশের উন্নাওতে বিজেপি এমএলএ কুলদীপ সেঙ্গার ধর্ষণ এবং খুনের দায়ে শাস্তি পেলেও পুলিশ এখনও তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করছে। আর এক নেতা চিন্ময়ানন্দ যে ছাত্রীকে ধর্ষণ করেছে, সেই নির্যাতিতা মেয়েটিকেই পুলিশ জেলে ভরেছে। দিল্লির প্রাক্তন বিজেপি এমএলএ বিজয় জোলি ধর্ষণে অভিযুক্ত। জম্মুতে আটবছরের শিশুর ধর্ষক এবং খুনিদের সমর্থনে বিজেপি মিছিল করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার নরেন্দ্র মোদির ছবি দিয়ে বেটি বাঁচাওয়ের যে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে তাতে বলা হয়েছে, কন্যাকে না বাঁচালে আপনাকে নরম রুটি করে দেবে কে? 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া', মঙ্গলে মহাকাশ যান পাঠানো ভারতে মেয়েদের এর থেকে বেশি দায়িত্বে ভাবতে পারেনি মোদি সরকার? চিন্তায় ভাবনায় আদ্যোপান্ত কর্তৃত্ববাদী পুরুষতন্ত্রের এই ছাপই হল আরএসএসের দর্শন। দিল্লিতে নির্ভয়ার ঘটনার পর আরএসএস নেতারা বলেছিলেন, মেয়েরা ঘরে থাকলেই আর ধর্ষণ হবে না। ধর্ষণে অভিযুক্ত বিজেপির স্নেহধন্য স্বঘোষিত অবতার আশারাম বাপু পরামর্শ দিয়েছিলেন, মেয়েটির উচিত ছিল ধর্ষণকারীদের ভাই বলে ডাকা। এমন সোনার রাজত্বই কি বিজেপি বাংলায় আনতে চাইছে!

বাংলায় ক্ষমতায় না থেকেও ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতা-কর্মী গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে দুর্নীতি, শিশু নারী পাচার, ধর্ষণ সহ নানা অপকর্মে জড়িত হয়ে নাম কিনেছেন। আর উদাহরণ বাড়িয়ে দরকার নেই। অমিত শাহ সাহেবদের 'সোনার বাংলা'র জন্য এই ক'টি উদাহরণই মানুষের হৃৎকম্পের জন্য যথেষ্ট। এমনিতেই কংগ্রেস এবং সিপিএমের ছেড়ে যাওয়া জুতোয় পা গলিয়ে তৃণমূল গণতন্ত্র হরণ, তোলাবাজি, নারী নির্যাতন, মদের অবাধ প্রসার, পাড়ায় পাড়ায় যথেচ্ছ বেলেল্লাপনার যে নজির গড়েছে, বিজেপির নজির এর থেকে কোনও অংশে কম নয়। তৃণমূলের আমলে পশ্চিমবঙ্গে চাষির আত্মহত্যা কমেনি কমার কথাও ছিল না। বেকারত্ব কমেনি, তা হওয়ারও ছিল না। তৃণমূলের অপশাসন দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে যেমন অতীতের কংগ্রেস, পরবর্তী সিপিএম জমানার দুঃস্বপ্নের কথা ভুলে গেলে বিপদ, একইভাবে বিজেপির মতো একচেটিয়া পুঁজির সেবাদাস মারাত্মক সাম্প্রদায়িক একটি শক্তিকে ডেকে আনা হবে মারাত্মক ভুল। নিছক ভোটের স্লোগানে না ভুলে দরকার কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা। যে কাজটি একমাত্র এস ইউ সি আই (সি) করে চলেছে। এর মধ্য দিয়েই সমস্যামুক্তির পথ পাওয়া সম্ভব। ভোটের বাজার গরম করতে অমিত শাহদের সোনার বাংলার স্লোগান শুনে মানুষ তাই সেই বহুল প্রচলিত কথাটিই স্মরণ করেছে— 'ভিক্ষা চাই না মা, কুকুর সামলা'।

অস্তিত্ব বিপন্ন

একের পাতার পর

বসবাস করছেন বা জঙ্গলের জমি চাষবাস করে জীবন নির্বাহ করছেন তাঁরা এই জমির পাট্টা পাওয়ার যোগ্য। যদি তাঁরা দেখাতে পারেন যে, ওই জমিতে তাঁরা তিন পুরুষ বা ৭৫ বছর ধরে বসবাস করছেন। কিন্তু এটা গ্রামের মানুষের পক্ষে দেখানো সম্ভব নয়। এর ফলে জঙ্গলে বসবাসকারী আদিবাসীদের জমির পাট্টা পাওয়া অসম্ভব হচ্ছে। কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্যে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস, বিজেপি বা বামপন্থী বলে পরিচিত দলগুলি পরিচালিত কোনও সরকারই শর্ত সহজ করে ও এই বিষয়ে প্রচার চালিয়ে ব্যাপকভাবে জঙ্গলে বসবাসকারী মানুষদের পাট্টা দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এখনও জঙ্গলে বসবাসকারী বহু আদিবাসী ও বনবাসী মানুষ জানেনই না যে তাঁরা যে জমিতে বসবাস করছেন বা চাষবাস করে দিনাতিপাত করছেন সেই জমির পাট্টার জন্য তাঁদের আবেদন করতে হবে। ফলে বেশিরভাগ মানুষ আবেদনই করেননি। যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকের আবেদন খারিজ হয়ে গেছে। আবার সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের মামলার রায়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ নতুন করে উচ্ছেদের সম্মুখীন হচ্ছে। ২৯ জানুয়ারি ২০১৬ সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয়,"যদি কোনও আবেদন দক্ষ আধিকারিক দ্বারা যোগ্য নয় বলে বিবেচিত হয় তাহলে আবেদনকারীর নাম পাট্টা বা এই আইনের অন্য অধিকারগুলি প্রাপকদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে এবং তাঁকে ওই জমি থেকে উচ্ছেদ বা তাঁর বিরুদ্ধে অন্য আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" এর দুই বছর পর ৭ মার্চ ২০১৮ সুপ্রিম কোর্টের রায়ে, "যাদের আবেদন বাতিল হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে" এবং "যাদের আবেদন বাতিল হয়েছে তাদের উচ্ছেদ সংক্রান্ত অবস্থা ও যে এলাকা থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে তার পরিমাপ কত"— এই বিষয়গুলি জানতে চাওয়া হয়। ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯-এর রায়ে বলা হয় যে, "পরবর্তী শুনানির পূর্বে বাতিল আবেদনগুলির আবেদনকারীদের উচ্ছেদ করে তার রিপোর্ট জানাতে হবে।"

জঙ্গলের অধিকার আইন ২০০৬-ও এক দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল, কোনও সরকারের দান নয়। ১৯৮৮ সালে রিজার্ভ ফরেস্ট অ্যাক্ট চালু করার ফলে দেশের এক কোটি মানুষ যখন উচ্ছেদের সম্মুখীন হয়েছিল তখনই দেশজুড়ে গড়ে ওঠা আন্দোলনের ফলেই জঙ্গলের অধিকার আইন প্রণয়ন করা হয় এবং ২০০৬ সালে ওই আইন চালু হয়। আদিবাসী ও গরিব মানুষের শোষণ, জুলুম, অত্যাচার থেকে রেহাই পেতে জঙ্গলকে কেন্দ্র করে বেঁচে থাকার যে চিরাচরিত অধিকার ছিল, জঙ্গলের অধিকার আইন-২০০৬-এর মধ্যে সেই সুযোগ যতটুকু ছিল ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯-এর সুপ্রিম কোর্টের রায়ে কার্যত তা কেড়ে নেওয়া হল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ, দেশীয় জমিদার এবং প্রশাসন জঙ্গলমহল সহ ছোটনাগপুরের মালভূমি এবং রাজমহল এলাকাতে আদিবাসী ও গরিব মানুষকে জমি থেকে উৎখাত করতে অবর্ণনীয় অত্যাচার চালিয়েছিল যার বিরুদ্ধে সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এই অঞ্চলের আদিবাসী ও গরিব মানুষ লাগাতার সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। রাজমহল এলাকাতে পাহাড়িয়া বিদ্রোহ, ভাগলপুর অঞ্চলে তিলকা মাঝির নেতৃত্বে বিদ্রোহ, হো বিদ্রোহ, ওরাঁও বিদ্রোহ, খেড়োয়ার বিদ্রোহ, সর্দার বিদ্রোহ, জঙ্গলমহলে চুয়াড় বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ, ভুমিজ বিদ্রোহ একের পর এক সংগ্রাম এভাবে সংগঠিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে জমিদার, মহাজন, আড়কাঠি ও ঠিকাদার এবং তাদের রক্ষক ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে ১৮৫৫-৫৬ সালে সাঁওতাল পরগণা এলাকাতে ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ বা 'হুল' সংগঠিত হয়েছিল। এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই সাঁওতাল পরগণা নামের উদ্ভব হয়েছিল এবং এই সমস্ত আদিবাসীদের জমি রক্ষার জন্য যে সমস্ত আইনি সংস্কার শুরু হয়েছিল তারই ধারাবাহিকতাতে ১৯৪৯ সালে স্বাধীন ভারতে সাঁওতাল পরগণা টেনান্সি অ্যাক্ট প্রণীত হয়। ১৮৭৮ সালের জঙ্গল আইনের প্রতিবাদ করার মধ্য দিয়েই বিরসা মুন্ডার ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের শুরু। ১৮৯৫-১৯০০ সাল ব্যাপী ছোটনাগপুর এলাকা জুড়ে বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলনের ফসল হিসাবেই ১৯০৮ সালে ছোটনাগপুর টেনান্সি অ্যাক্ট প্রণীত হয়েছিল। ফলে বহু রক্ত ও জীবন বলিদানের মধ্য দিয়ে যে আইনগুলি তদানীন্তন শাসকেরা চালু করতে বাধ্য হয়েছিল তা শাসক শ্রেণি দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থে এখন কেড়ে নিতে বদ্ধপরিকর হয়েছে।

বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। বর্তমান নতুন কর্মসংস্থান দূর অস্ত্। কল কারখানা গড়ে তুলে কর্মসংস্থানের সুযোগের কোনও সম্ভাবনা নেই। বরঞ্চ প্রতিনিয়ত কলে-কারখানায় ছাঁটাই, লে-অফ, লক-আউট, ক্লোজারের ফলে কোটি কোটি সংখ্যায় নতুন করে বেকার তৈরি হচ্ছে। গ্রামেও কাজের কোনও সুযোগ নেই। সেচের সুবন্দোবস্ত না থাকা এবং বীজ, সার সহ কৃষি উপকরণের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে চাষবাস করে চাষিরা ঋণগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যা করছেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি, চিকিৎসার ব্যয় বৃদ্ধি, বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি, শিক্ষায় ফি বৃদ্ধি, শিক্ষাসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকাই অসম্ভব করে তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে লক্ষ লক্ষ মানুষ রুটি-রুজি এবং বাসস্থান হারাতে চলেছে। এর বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে। সকল শোষিত মানুষ ও সবস্তরের গণতন্ত্রপ্রিয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আদিবাসী ও চিরাচরিত বনবাসীদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন। লক্ষ লক্ষ আদিবাসী ও জঙ্গলে বসবাসকারী মানুষের উচ্ছেদ প্রতিরোধে 'সারা ভারত জন অধিকার সুরক্ষা কমিটি' আগামী ৩০ মার্চ পার্লামেন্ট অভিযানের আহ্বান জানিয়েছে।

সারা ভারত জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির দাবি— ১) আদিবাসী ও বনাঞ্চলের মানুষদের কোনওভাবেই বসবাসের এলাকা থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না, আবেদনকারীদের জীবন-জীবিকা সুনিশ্চিত করতে অধিকৃত জঙ্গলের জমির পাট্টা দিতে হবে, সামুদায়িক জঙ্গলের অধিকার দিতে হবে এবং জঙ্গলে প্রবেশের অধিকার ধারাবাহিকভাবে দিতে হবে। ২) বিভিন্ন রাজ্যের জমি রক্ষা সংক্রান্ত আইনগুলি এবং ছোটনাগপুর টেনান্সি অ্যাক্ট ও সাঁওতাল পরগণা টেনান্সি অ্যাক্ট সংশোধন করে আদিবাসী ও গরিব মানুষদের জমির অধিকার কেড়ে নেওয়া চলবে না। ৩) আদিবাসীদের ছিন্নমূল না করে তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটাতে হবে। ৪) আদিবাসীদের এবং গরিব পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীগুলির আর্থিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ৫) আদিবাসী ও গরিব মানুষের জন্য প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করতে হবে। ৬) এস সি/এস টি আইডেন্টিফিকেশন অ্যাক্ট বাতিল করে আদিবাসী ও তফসিলি জাতির পরিচয়পত্র প্রদান সহজ করতে হবে। ৭) তফসিলি জাতি ও উপজাতি নাগরিকদের সামাজিক মর্যাদাকে সুরক্ষিত করতে হবে।

মার্কসবাদ আজও সমান প্রাসঙ্গিক

মহান মার্কসের বিশ্লেষকে ভ্রান্ত প্রমাণ করার যত অপচেষ্টাই প্রচারযন্ত্র চালাক, সময়ের পরীক্ষায় তা উত্তীর্ণ হয়েছে।

বিশ্বে যখনই আরও একটি অর্থনৈতিক সংকটের বিপদঘন্টা ধ্বনিতহয়, দেখা যায় কার্ল মার্কসের রচনাগুলির বিক্রি ঝড়ের গতিতে বাড়ছে। পুঁজিবাদ কীভাবে কাজ করে ও মানব সমাজে তার পরিণাম কী কী হয়— তা উনিশ শতকের এই জার্মান চিন্তাবিদ যেভাবে বুঝেছিলেন, খুব কম জনই সেভাবে বুঝেছিল।

কার্ল মার্কস তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন যে আদর্শ ও চিন্তাগুলির জন্য, সর্বগ্রাসী প্রচারযন্ত্র তাকে অস্বীকার করতে ও তাঁর চিন্তার মৃত্যুঘন্টা বাজাতে যত চেষ্টাই চালাক, মার্কসবাদ তাকে প্রতিহত করে জীবন্ত রয়েছে শুধু দুনিয়াকে বোঝার একটি পদ্ধতি হিসাবেই নয়, দুনিয়া পাল্টাবার একটি হাতিয়ার হিসাবেও।

মার্কসের দশটি ভবিষ্যদ্বাণী যা মার্কসের জন্মের দুশো বছর পরেও একুশ শতকীয় অর্থনীতির চলনকে সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে, তা পড়লেই পাঠকরা বুঝবেন, তিনি আজও কত প্রাসঙ্গিক।

১। পুঁজির ঘনীভবন ও কেন্দ্রীভবন

কার্ল মার্কসের অনন্য প্রতিভায় ভাস্বর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে তিনি পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেছেন এবং পুঁজির ঘনীভূত ও কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

ঘনীভবনের প্রথম ধারণাটি উদ্বৃত মূল্যের সঞ্চয়ের কথা বলে। এই উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হয় শ্রমিকের উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি থেকে (উদ্বৃত্ত শ্রম) , যা মুনাফা হিসাবে আত্মসাৎ করে পুঁজিপতি। কেন্দ্রীভবনের ধারণাটিতে পুঁজি বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। প্রায় সময়ই দেউলিয়া হওয়ার কারণে বা অর্থনৈতিক সংকটের ফলে বহু ব্যক্তি-পুঁজির কেন্দ্রীভূত হওয়ার পরিণামে পুঁজির এই বৃদ্ধি ঘটে।

সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে বাজারের অন্ধ হাতের ক্ষমতায় যারা বিশ্বাসী তাঁদের কাছে মার্কসের এই বিশ্লেষণের তাৎপর্য সর্বনাশা।

মার্কস বলেছিলেন, ধনী-গরিবে ক্রমবর্ধমান ফারাক পুঁজিবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আজ ২১ শতকে আমরা সেটাই দেখছি। 'অক্সফ্যাম'-এর সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৭ সালে গোটা বিশ্বে উৎপাদিত সম্পদের ৮২ শতাংশ গেছে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১ শতাংশের হাতে। বাকি দরিদ্রতম অংশের ৩৭০ কোটি মানুষের সম্পদ যৎসামান্যও বৃদ্ধি পায়নি।

২। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অস্থিরতা এবং সংকটের চক্র

অর্থনৈতিক সংকট যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কোনও ভ্রান্তির কারণে নয়, তা এই ব্যবস্থার সহজাত বৈশিষ্ট্য— এ কথা প্রথম যাঁরা বলেছিলেন, মার্কস ছিলেন তাঁদের অন্যতম। যদিও আজও এ সম্পর্কে অন্যরকম ধারণা ফেরি করার চেষ্টা চলে।

যাই হোক, মার্কস অর্থনীতির চলনের যে রূপরেখা এঁকে গিয়েছিলেন, সেই পথ ধরেই যে ১৯২৯ সালের শেয়ার বাজারে ধসের ঘটনা থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক ২০০৭-'০৮-এর বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক সংকট ঘটেছে, তা অত্যন্ত স্পষ্ট। সেই কারণেই সমস্যার সমাধান মেলার আশায় এমনকি ওয়াল স্ট্রিটের রাঘব-বোয়ালদেরও 'ক্যাপিটাল'-এর পাতা ওল্টাতে হয়েছে!

৩। শ্রেণি সংগ্রাম

১৮৪৮ সালে 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'-তে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস বলেছিলেন, "এযাবৎ কাল পর্যন্ত সমস্ত বিদ্যমান সমাজের ইতিহাস হল শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস"। ওঁদের এই উপলব্ধি সম্ভবত মার্কসবাদের সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক উপলব্ধি।

এর ফলে উদারনৈতিক চিন্তাবিদরা সংকটে পড়ে যান। কারণ, মার্কসের মতে আধিপত্যকারী শ্রেণি নিজের মূল্য ও নিজের শ্রেণির পুনরুৎপাদন করতে করতে যে সব অস্ত্রের সাহায্যে অবশিষ্ট অংশের মানুষের উপর কর্তৃত্ব করে তার অন্যতম হল পুঁজিবাদী রাষ্ট্র।

দেড়শো বছর পর, এখনও কর্তৃত্বকারী ১ শতাংশের সঙ্গে সামাজিক সংগ্রাম চলছে বাকি ৯৯ শতাংশের।

৪। সংরক্ষিত শ্রমিক বাহিনী

মার্কসের তত্ত্ব অনুযায়ী, সর্বোচ্চ মুনাফা পাওয়ার জন্য পুঁজিপতিকে মজুরি কমিয়ে রাখতে হয়। পুঁজিপতি ততক্ষণই এমন করতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত কম মজুরিতে কাজ করতে অরাজি শ্রমিকের জায়গায় আরেক জন কাজ করতে রাজি থাকে। কাজ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে থাকা এই দ্বিতীয় শ্রমিকই হল 'সংরক্ষিত শ্রমিক বাহিনী'।

১৯ শতক থেকে সামাজিক সংগঠন ও শ্রমিক সংগঠনগুলির লাগাতার সংগ্রামের ফলে বিশেষ করে অগ্রসর দেশগুলিতে পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন ঘটলেও বাণিজ্য ক্ষেত্রেও কম মজুরির অনুসন্ধান এখনও চলছে।

বিশ শতক জুড়ে কম মজুরিতে দক্ষ শ্রমিক পাওয়ার উদ্দেশ্যে ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ উৎপাদক কোম্পানিগুলি এশিয়াতে পাড়ি দেয়।

এতে দেশের বেকারদের জন্য চাকরির সংখ্যা কমে যাচ্ছে বলে বহু সরকারই আপত্তি তুলেছে। উদাহরণ স্বরূপ আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্প সরকারের কথা বলা যায়। তা সত্ত্বেও বৃহৎ কোম্পানিগুলি সস্তা শ্রম ব্যবহার করে শ্রমিকদের শোষণ করে মুনাফার চড়া হার বজায় রেখে চলেছে।

মজুরির হার কেমন? সাম্প্রতিক সমীক্ষাগুলি দেখাচ্ছে, যা কিছু

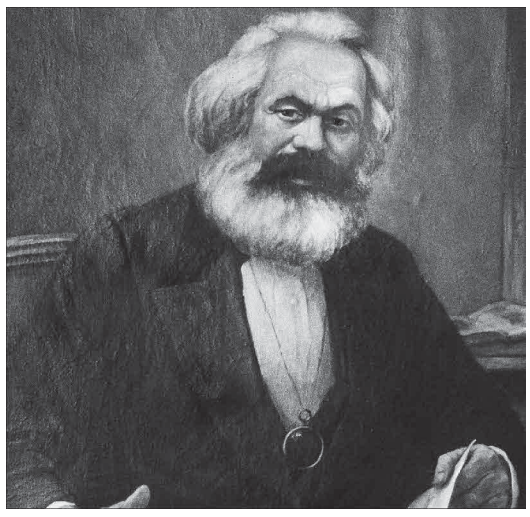

কেনা সম্ভব তার ভিত্তিতে শ্রমিকদের ক্রয়ক্ষমতা পশ্চিমী দেশগুলিতে গত প্রায় ৩০ বছর ধরে ক্রমাগত কমে চলেছে। এবং কোম্পানির পরিচালকবর্গের সঙ্গে নিচের তলার কর্মচারীদের মজুরির বৈষম্য ক্রমাগত বাড়ছে।

'দ্য ইকনমিস্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ অনুসারে দেখা যাচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে গত দুই দশক ধরে শ্রমিকদের বেতন বাড়ছে না, কিন্তু বড়কর্তাদের বেতন বৃদ্ধি হচ্ছে চোখে পড়ার মতো— গড় বেতনের ৪০ গুণ থেকে বেড়ে এইসব কার্যনির্বাহী পরিচালকদের বেতন হয়েছে গড় বেতনের ১১০ গুণ বেশি। আমাদের ভারতবর্ষের ছবিও অন্যরকম কিছু নয়।

৫। ফিনান্স পুঁজির ভূমিকা

পুঁজির পুঞ্জীভবনের প্রক্রিয়ার মধ্যে শোষণ-পদ্ধতি কেমন ভাবে নিহিত রয়েছে, মার্কস তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন। ফিনান্স পুঁজি— অর্থনীতিতে বস্তুগত উৎপাদনে যার ভূমিকা নেই, 'কোম্পানির কাগজ' (প্রমিসারি নোট) বা 'বন্ড'-এর মতো সেই কল্পিত বিষয়টি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে সমালোচনা করেছেন মার্কস। বর্তমানে অর্থনীতির এই বিভাগটির যে পরিমাণ স্ফীতি ঘটেছে, কম্পিউটারের সাহায্যে আলোর চেয়েও দ্রুত গতিতে যেভাবে আর্থিক লেনদেন ঘটছে, মার্কসের কালে তা ছিল অকল্পনীয়।

ফাটকা কারবার এবং জটিল আর্থিক ক্রিয়াকলাপের রমরমা, যার উদাহরণ হিসাবে ২০০৭-'০৮-এ বিশ্ব অর্থনীতিতে সংকট ডেকে আনা তথাকথিত 'সাবপ্রাইম'-এর কথা উল্লেখ করা যায়, তা মার্কসের উদ্বেগের যথার্থতা প্রমাণ করে।

৬। কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি

মার্কসের উনিশ শতক যখন রেডিও-টিভিতে বিজ্ঞাপনের বিস্ফোরণ ঘটেনি, ইন্টারনেটের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ব্যক্তির বিশেষ পছন্দের দিকে লক্ষ্য রেখে বিজ্ঞাপন ছড়ানোর আধুনিক কৌশল দূর অস্ত্— সেই সময়েই মার্কস পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং মানুষের মধ্যে কৃত্রিম প্রয়োজনবোধ সৃষ্টি করার ক্ষমতা সম্পর্কে সাবধান করে গেছেন।

একশো পঞ্চাশ বছর আগেই মার্কস বলেছিলেন, পণ্য ও প্রয়োজনের প্রসার পুঁজিবাদে হয়ে দাঁড়ায়, মানুষের মধ্যে অমানবিক, অতি আধুনিক, অস্বাভাবিক পণ্যক্ষুধা সৃষ্টির উপায়।

আজকের পৃথিবীতে নতুন সেল ফোন মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই পুরনো হয়ে পড়ছে এবং তখন বিজ্ঞাপন মানুষকে বোঝায় আধুনিকতম মডেলটি কেনবার অতি-আবশ্যকতা। গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলি এমন পরিকল্পনা করে তৈরি করা হচ্ছে যাতে সেগুলি কয়েক বছরের মধ্যেই অকেজো হয়ে পড়ে এবং সে সব বাতিল করে নতুন নতুন জিনিসপত্র কেনার প্রয়োজন দেখা দেয়।

৭। বিশ্বায়ন

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে মার্কস ও এঙ্গেলস লিখেছিলেন, "উৎপাদিত পণ্যের জন্য নিরবচ্ছিন্ন ও ক্রমবর্ধমান বাজারের প্রয়োজন বুর্জোয়া শ্রেণিকে গোটা বিশ্ব জুড়ে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। সব জায়গায় তারা বাসা বাঁধে, উপনিবেশ স্থাপন করে, সর্বত্র যোগাযোগ তৈরি করে"।

ভোগসর্বস্ব সংস্কৃতিক যে ছবি সেদিন তাঁরা এঁকেছিলেন, আজকের বিশ্বায়িত বাজারে তাকে পুরোপুরি যথার্থ বলে মনে হয়।

৮। একচেটিয়া পুঁজির প্রাধান্য

একইসঙ্গে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বহুজাতিক পুঁজির সৃষ্টি। ক্লাসিকাল উদারনৈতিক অর্থনৈতিক তত্ত্ব ধরে নিয়েছিল যে, প্রতিযোগিতা থাকলে বহু-মালিকানা থাকবে। এক ধাপ অগ্রসর হয়ে মার্কস দেখিয়েছেন, সবচেয়ে ক্ষমতাশালী পুঁজির নিয়মের ভিত্তিতে বাজারের প্রবণতা হল পুঁজির একচেটিয়াকরণ।

প্রচারমাধ্যম, টেলিফোন ও তেল কোম্পানিগুলির মিলেমিশে গিয়ে বৃহৎ কর্পোরেশন গঠন হল মার্কস বর্ণিত পদ্ধতির সাম্প্রতিক উদাহরণ।

৯। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আত্মধ্বংসী প্রবণতা

'যা কিছু স্থাণু, পুঁজিবাদ তাকে হাওয়ায় মিলিয়ে দেয়'— এ হচ্ছে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে বর্ণিত মার্কস-এঙ্গেলসের অন্যতম উন্নত উপলব্ধি।

পুঁজিবাদের সৃজনশীল ও একই সঙ্গে আত্মধ্বংসী চরিত্র মার্কস ও এঙ্গেলস যথাযথ ভাবে বুঝেছিলেন। যে কোনও মূল্যে উৎপাদনশীলতার পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে এই ব্যবস্থা উৎপাদন ও অস্থায়ী ভোগের এক অমানবিক চক্র চাপিয়ে দেয়।

সংক্ষেপে এই প্রবণতাই বর্তমানে আমাদের গ্রহটিকে ধ্বংসের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে।

মানুষের জীবনের উপর বিশ্ব জুড়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কুপ্রভাব বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের মতো রাষ্ট্রপ্রধানরা এ কথা অস্বীকার করে চলেছেন।

১০। শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লব ঘটানোর সম্ভাব্যতা

পুঁজিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুগভীর বিশ্লেষণই শুধু নয়, বরং সাম্যবাদের ভিত্তিতে এক নতুন ধরনের সমাজ গড়ে তোলার আহ্বানই হল ইতিহাসে মার্কসের সর্বোত্তম অবদান।

নিপীড়ন ও অসাম্য থেকে চিরতরে মুক্তি অর্জন করার ক্ষমতা যে সর্বহারা শ্রেণির আছে, মার্কসের এই বার্তা বিশ শতককে পাল্টে দিয়েছে এবং রাশিয়া, চীন, ভিয়েতনাম ও কিউবা সহ নানা দেশে সংঘটিত বিপ্লবে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। আজ এই একুশ শতকেও তাঁর আহ্বান— 'দুনিয়ার শ্রমিক এক হও' একইভাবে কার্যকরী রয়েছে।

(তথ্যসূত্র ঃ কিউবার গ্রানমা ইন্টারন্যাশনাল)

সংগ্রহ করুন

মহান কার্ল মার্কস স্মরণে

প্রভাস ঘোষ

এনআরসি-সিএএ-এনপিআর বিরোধী
ধরনা, নাগরিক কনভেনশন

মুর্শিদাবাদ ঃ নাগরিকত্ব হরণকারী সিএএ-এনপিআর-এনআরসি বাতিল ও রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট বর্বরোচিত দিল্লির গণহত্যার প্রতিবাদে ধরনা অবস্থান আন্দোলনে সামিল হলেন রঘুনাথগঞ্জ-২ এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটি। ২৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ এই কর্মসূচি চলে স্থানীয় সম্মতিনগরের রণজিৎপুর বাজারে। এই আন্দোলনকে ঘিরে এলাকার শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল, ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল লক্ষণীয়। এলাকার বিশিষ্টজন ছাড়াও জেলার বিভিন্ন সংস্থা, ফোরাম, গণসংগঠন গণসঙ্গীত, কবিতা ও বক্তব্যের মাধ্যমে এনআরসি, সিএএ, এনপিআর-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। ১ মার্চ সহস্রাধিক মানুষ রাস্তা অবরোধ করে দিল্লি গণহত্যায় ধিক্কার জানিয়ে অমিত শাহর কুশপুতুল পোড়ায়। ২৭ জন বক্তা বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য রাখেন মুর্শিদাবাদ জেলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বকুল খন্দকার ও গৌতম সাহা, হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী মোফাক্কেরুল ইসলাম, পলাশী নেতাজি সুভাষ ধর্না মঞ্চের সংগঠক কামালউদ্দিন, বিশিষ্ট শিক্ষক জামালউদ্দিন, অশোক ভট্টাচার্য, আনসার মিঞা প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন প্রকাশ সরকার। সমগ্র কর্মসূচি পরিচালনা করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ রবিউল আলম ও এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির সম্পাদক শিক্ষক গোলাম সারওয়ার।

কলকাতা ঃ সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটি, কলকাতার উদ্যোগে ৩ মার্চ নারকেলডাঙার মোমিন হাইস্কুলে ৩৫০ জনের উপস্থিতিতে কনভেনশন হয়। স্থানীয় ডাক্তার মকবুল হোসেনকে প্রেসিডেন্ট এবং স্থানীয় গৃহবধূ ফারহা নাজ (বিট্টু) এবং আইনজীবী আফরিন আহমেদকে যুগ্ম সম্পাদক করে ১০৫ জনের কমিটি গঠিত হয়। কলকাতা জেলার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সুব্রত দাস এবং আয়েসানুল হক।

নারকেলডাঙা, কলকাতা

বোলপুর ঃ বীরভূমের বোলপুর মহকুমার বিশিষ্টজন সহ শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক এবং বিশ্বভারতীর ছাত্র-শিক্ষকদের আহ্বানে ১ মার্চ বোলপুর হাই স্কুলে নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের বহুত্ববাদী সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, নবজাগরণের মূল্যবোধ, স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহ্য ও মনুষ্যত্ব রক্ষা করতে কেন এনআরসি, এনপিআর ও সিএএ প্রতিরোধ প্রয়োজন, সে বিষয়ে ১৫ জন আলোচনা করেন। কনভেনশন থেকে ৫০ জনের কমিটি গঠিত হয়। অধ্যাপক মিঠুন সিংহরায় ও শিক্ষক মহম্মদ আফলাতুন ইনসান যুগ্ম সম্পাদক, বিজয় সরকার সভাপতি, শিক্ষক সৌনক পাল কার্যকরী সভাপতি ও শিক্ষিকা বিউটি সাহা কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

বারুইপাড়া, নদিয়া

নদিয়া ঃ ১ মার্চ কল্যাণী ঘোষপাড়া লালন মঞ্চে এনআরসি, এনপিআর ও সিএএ বিরোধী নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক এ জামান। আলোচনা করেন ডাঃ অপূর্ব রায়। সভায় উপস্থিত ছিলেন রাণাঘাট এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির সম্পাদক জয়দেব মুখার্জী এবং সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির সদস্য পার্থ ভট্টাচার্য। ডঃ এ জামানকে সভাপতি এবং পিন্টু সাহা ও মিহির পালকে যুগ্ম সম্পাদক করে কল্যাণী এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটি গঠন করা হয়।

ডিএসও-র উদ্যোগে ছত্তিশগড়ের ধমতরীতে এনআরসি বিরোধী কনভেনশন। ১৬ ফেব্রুয়ারি

১ মার্চ মধ্যপ্রদেশের গুনায় বেসরকারিকরণ এবং সিএএ-এনআরসি-এনপিআর বাতিলের দাবিতে নাগরিক কনভেনশন। আয়োজক 'নিজিকরণ বিরোধী আন্দোলন সমিতি'।

জীবনাবসান

পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও সাহসী পার্টিকর্মী কমরেড গোপাল মোদক ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে কয়েক মাস রোগভোগের পর ১৯ ফেব্রুয়ারি ৮১ বছর বয়সে দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

৬০-দশকের মাঝামাঝি ওয়ার্কার্স পার্টির একদল নেতা-কর্মী ওই দল ত্যাগ করে এস ইউ সি আই (সি)-তে যোগ দেন। তাঁদের অন্যতম ছিলেন কমরেড গোপাল মোদক।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় ৬০-এর দশকের গোড়ায় ওয়ার্ক-চার্জ শ্রমিক হিসাবে রিফ্র্যাকটরিজ বিভাগে যোগ দেন। সেই সময় দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় দুর্গাপুর কন্ট্র্যাকটর মজদুর ইউনিয়ন গঠনের সময় নেতৃত্বকারী ভূমিকা নেন। ১৯৭২ সালে যখন সিটুর সাথে মতপার্থক্যের পরিণামে আলাদাভাবে দুর্গাপুর স্টিল ওয়ার্কার্স কো অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করার প্রয়োজন দেখা দেয় তখনও কমরেড গোপাল মোদকের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।

মাঝে বেশ কিছুদিন পারিবারিক নানা সমস্যার ফলে দলের কাজে কিছুটা শিথিলতা এসেছিল। শেষের ৭/৮ বছর দলের কাজে বয়সের ভার ও শারীরিক নানা সমস্যা উপেক্ষা করে প্রায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করছিলেন। কিন্তু দুরারোগ্য ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ায় মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠল। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন বিশ্বস্ত, সাহসী ও নিষ্ঠাবান কর্মীকে হারাল।

ওই দিন তাঁর মরদেহ ডিএসপি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়। পরদিন সকাল দশটায় মরদেহ পশ্চিম বর্ধমান জেলার মূল কার্যালয়ে আনা হলে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান পার্টির পলিটবুরো সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডুর পক্ষে জেলা কমিটির সদস্য কমরেড প্রভাতী গোস্বামী। জেলা সম্পাদক কমরেড সুন্দর চ্যাটার্জী সহ উপস্থিত জেলা কমিটির অন্যান্য সদস্য এবং কর্মী, সমর্থক ও পার্টির শুভানুধ্যায়ীরা তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

পার্টি অফিস থেকে তাঁর কর্মস্থান বি-জোনে মরদেহ আনার পর শেষযাত্রা সম্পন্ন হয়। ৫ মার্চ ডিএসডবলুসিসি ইউনিয়ন অফিসে স্মরণসভা হয়।

কমরেড গোপাল মোদক লাল সেলাম

ডাঃ কাফিল খানের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি
বিক্ষোভে চিকিৎসক-চিকিৎসাকর্মীরা

১২ ডিসেম্বর আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে সিএএ বিরোধী বক্তৃতাকে অজুহাত করে ডাঃ কাফিল খানের বিরুদ্ধে যোগী সরকার দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনে এবং মুম্বাই থেকে গ্রেপ্তার করে। দেশবাসী তাঁর মুক্তির দাবিতে সরব হয় এবং আলিগড় কোর্ট তাঁর জামিনের নির্দেশ দেয়। কিন্তু ১০ ফেব্রুয়ারি তাঁকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়ার বদলে নতুন করে ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট (এনএসএ)-এ মামলা দেওয়া হয়। যার ফলে ৬ মাস থেকে ২ বছর পর্যন্ত বিনা বিচারে যোগী সরকার তাকে কারাবন্দি করে রাখতে পারবে। তাঁর স্ত্রী অভিযোগ করেছেন মথুরা জেলের অভ্যন্তরে ডাঃ খানের উপর অমানবিক অত্যাচার চলছে, সেখানে তাকে টানা ৫ দিন অনাহারে রেখে দেওয়া হয়েছে। ২৩ ফেব্রুয়ারি তাঁর মামাকে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। মথুরা কারাগারের অভ্যন্তরে যে ভাবে তাকে দাগী অপরাধী ভরা একটি কক্ষে রেখে অত্যাচার করা হচ্ছে, বাস্তবিকই এখন ডাঃ খানের প্রাণহানির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

শুধু সিএএ বিরোধী বক্তৃতার জন নয়, ডাঃ কাফিল খান উত্তরপ্রদেশের শিশুমৃত্যুর নেপথ্যে যোগী সরকারের অপদার্থতা ফাঁস করে দিয়েছেন। এই কারণে তাকে উপর্যুপরি হেনস্থা করা হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশে গোরক্ষপুর বিআরডি মেডিকেল কলেজে ২০১৭-তে অক্সিজেনের অভাবে অসংখ্য শিশু মারা যায়। উত্তরপ্রদেশ সরকার নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে চিকিৎসায় অবহেলার মিথ্যা অভিযোগে ডাঃ কাফিল খানকে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে ৯ মাস কারাবন্দি করে। সুপ্রিম কোর্ট ও কলেজের বিভাগীয় তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে যোগী সরকার কোনও প্রমাণ দাখিল করতে পারেনি।

ডাঃ খানের অবিলম্বে নিঃশর্তে মুক্তির দাবিতে ৬ মার্চ মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের পক্ষ থেকে এনআরএস মেডিকেল কলেজের সামনে একটি বিক্ষোভ সভা এবং মিছিল আয়োজিত হয়। কয়েকশো চিকিৎসক, নার্স, প্যারামেডিকেল কর্মী, মেডিকেল ও নার্সিং ছাত্রছাত্রী, বিভিন্ন পেশার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এই মিছিলে সামিল হন।

সংগঠনের কলকাতা জেলা সম্পাদক ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র বলেন, যোগী সরকারের ন্যাক্কারজনক প্রতিহিংসার প্রতিবাদে আমরা প্রথম থেকেই রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছি। আজ দেশের এমন পরিস্থিতি যে দোষীর বিরুদ্ধে মামলা করতে বললে বিচারক শাস্তি পান, কাফিলের মতো মানুষ বিনা বিচারে কারারুদ্ধ থাকেন। আমরা সকল গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে আবেদন করছি, একজন সত্যিকারের মানবদরদি চিকিৎসক ডাঃ কাফিল খানের জীবনরক্ষার জন্য এগিয়ে আসুন।

বৈষম্যমূলক ভিসা-নিয়ম বাতিল করতে হবে

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৫ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন, আমরা সংবাদমাধ্যম থেকে এ কথা জেনে বিস্মিত হয়েছি যে, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে ভিসা নিয়ে যাঁরা ভারতে আসছেন, তাঁদের প্রতি ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য করা হচ্ছে। কোনও হিন্দু অথবা অ-মুসলমান কেউ যদি ভিসার নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ভারত থেকে ফিরে না যেতে পারেন, তাহলে তাঁর ক্ষেত্রে জরিমানা হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ দাবি করা হচ্ছে, একই ক্ষেত্রে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের জন্য সেই জরিমানার পরিমাণ বহু গুণ বেশি।

আমরা এই জঘন্য বৈষম্যমূলক নিয়ম, যা আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ও সভ্যতার পরিপন্থী, তার তীব্র নিন্দা করছি এবং অবিলম্বে এই হীন নিয়ম বাতিল করার দাবি জানাচ্ছি।

ওয়েভারলি জুটমিল খোলার দাবি

এআইইউটিইউসির উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক প্রদীপ চৌধুরী এবং বেঙ্গল জুট মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অমল সেনের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল শ্যামনগরের বন্ধ ওয়েভারলি জুট মিল অবিলম্বে খোলা ও শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়ে ২৭ ফেব্রুয়ারি ব্যারাকপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে ডেপুটেশন দেন। তাঁরা স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেন, ব্যারাকপুর লেবার কমিশনারের দপ্তরে চুক্তি, জগদ্দল থানায় বসে ত্রিপাক্ষিক সিদ্ধান্ত সমস্ত কিছুকে অগ্রাহ্য করে মিল কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এ কাজ করল। এর ফলে তিন হাজার শ্রমিক পরিবারে চরম দুর্দশা নেমে এসেছে। তাঁরা দাবি করেন—অবিলম্বে ওয়েভারলি জুট মিল খুলতে হবে এবং সুষ্ঠুভাবে চালাতে হবে, শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি অবিলম্বে দিতে হবে, শ্রমিকদের পিএফ-এর বকেয়া ১৮ কোটি টাকা জমা দিতে হবে, শ্রমিকদের গ্র্যাচুইটির টাকা দিতে হবে। মহকুমা শাসক অবিলম্বে বৈঠকে বসার জন্য মালিকপক্ষকে চিঠি দেবেন বলে জানান।

কর্ণাটকে বাসের ভাড়া বাড়াল বিজেপি

প্রতিবাদ এস ইউ সি আই (সি)-র

কর্ণাটকের বিজেপি সরকার বাসের ভাড়া ১২ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে। এর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি) বাঙ্গালোর জেলা কমিটি টাউন হলের সিটি সেন্টারে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে ২৭ ফেব্রুয়ারি। রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড ভি জ্ঞানমূর্তি বলেন, রান্নার গ্যাস, পেট্রল, দুধ ইত্যাদির দাম উর্ধ্বমুখী। এর উপর বাসের ভাড়াবৃদ্ধি আরও মূল্যবৃদ্ধি ঘটাবে। তিনি এই অন্যায় ভাড়াবৃদ্ধি প্রত্যাহারের দাবি জানান। সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড জি হনুমেশ।

● সবেতন সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণা ● নিরাপত্তা ও সম্মানজনক কাজের পরিবেশ সুনিশ্চিত করা ● মাতৃত্বকালীন ছুটি সহ সরকারি আর্থিক অনুদান প্রদান ও পেনশন চালু ● এনআরসি, সিএএ, এনপিআর বাতিল ● মদ ও মাদকদ্রব্য অবিলম্বে বন্ধ ● শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, পাচার, ধর্ষণ রুখতে কঠোর পদক্ষেপ, ● সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পদ্ধতি সরলীকরণ করার দাবিতে

সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির আহ্বানে

৩০ মার্চ

মিছিল এবং শ্রমমন্ত্রীকে ডেপুটেশন

জমায়েত ঃ সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, ১২টা

শ্রমিক কর্মচারীদের ১১ দফা দাবিতে জেলাশাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে ডেপুটেশন। রোহতক, হরিয়ানা।

মহান স্ট্যালিন স্মরণে

৫ মার্চ মহান নেতা কমরেড স্ট্যালিন স্মরণ দিবসে কলকাতায় কেন্দ্রীয় অফিসে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। উপস্থিত রয়েছেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ

গড়িয়ায় দলের অফিস উদ্বোধন

১ মার্চ কলকাতার উপকণ্ঠে গড়িয়ার নবগ্রামে পার্টি অফিস উদ্বোধন করেন এসইউসিআই(সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। সভাপতিত্ব করেন গড়িয়া লোকাল কমিটির বর্ষীয়ান সদস্য কমরেড অসীম চ্যাটার্জী। সকলের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে কীভাবে অফিস গড়ে উঠেছে, লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড সন্দীপন মহাপাত্র অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে তা বলেন। একটি বিপ্লবী দলে অফিসের গুরুত্ব কী ও বর্তমান সময়ে কীভাবে সাধারণ মানুষের পাশে থেকে তাদের দাবি নিয়ে লড়াই আন্দোলন করতে হবে সেই বার্তা দেন প্রধান বক্তা কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। সভাপতির ভাষণ ও আন্তর্জাতিক সঙ্গীত এর মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

দাম কমানোর দাবিতে বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন

কোচবিহার ঃ ১৬ ফেব্রুয়ারি কোচবিহার শহরের সুকান্ত মঞ্চে (সঞ্জিত বিশ্বাস মঞ্চ) অ্যাবেকার নবম কোচবিহার জেলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অ্যাবেকার রাজ্য সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুব্রত বিশ্বাস। সম্মেলনে প্রশ্ন ওঠে, যেহেতু কয়লার দাম ৪০ শতাংশ কমেছে, ৭ শতাংশ জিএসটি কমেছে, কারিগরি ও বাণিজ্যিক ক্ষতি কমেছে ২ শতাংশ, এর ফলে রাজ্য বিদ্যুৎ কোম্পানির সাশ্রয় হয়েছে ৬৩৭৮.০৬ কোটি টাকা। তাহলে বিদ্যুতের মাশুল ৫০ শতাংশ কমানো হবে না কেন? এছাড়া মাসে মাসে বিদ্যুতের মাশুল বাড়ানোর কালা রেগুলেশন এমভিসিএ বাতিল করার দাবিও তোলা হয় সম্মেলন থেকে।

সম্মেলন পরিচালনা করেন অ্যাবেকার কোচবিহার জেলা কমিটির সভাপতি সমীর গুহ মজুমদার। সমীর গুহ মজুমদারকে সভাপতি, অমর পালকে কার্যকরী সভাপতি এবং কাজল চক্রবর্তীকে সম্পাদক করে ৩৫ জনের একটি কমিটি গঠন করা হয়।

বাঁকুড়া ঃ ১ মার্চ অ্যাবেকা ইন্দাস ব্লক কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ব্লকের আকুই বাজারের কেন্দ্রীয় হাটতলায়। কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহক সহ দেড় শতাধিক গ্রাহক সম্মেলনে যোগ দেন। সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ শিক্ষক রামকৃষ্ণ কারফা। প্রধান বক্তা সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী গ্রাহক আন্দোলনের অর্জিত অধিকার এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দিকগুলি তুলে ধরেন। রামকৃষ্ণ কারফাকে সভাপতি, নবকুমার দেবশর্মাকে সম্পাদক, দেবব্রত হাজরাকে মুখ্য উপদেষ্টা করে ৪০ জনের কমিটি গঠিত হয়।

ভিওয়ানিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

৪ মার্চ শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি-র স্থানীয় শাখার পক্ষ থেকে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবিপত্র পেশ করা হয়। ভিওয়ানি জেলা কমিটির আহ্বানে শ্রমিক-কর্মচারীরা নেহেরু পার্কে সমবেত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। স্মারকলিপিতে তাঁরা দাবি করেন— অঙ্গনওয়াড়ি-আশা-মিড ডে মিল কর্মী-সাফাই কর্মচারী-স্বনির্ভর গোষ্ঠী- চৌকিদার প্রমুখদের সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি দিতে হবে, নির্মাণকর্মী-খেতমজুরদের সহজ প্রক্রিয়ায় নথিভুক্ত করতে হবে, অসংগঠিত ক্ষেত্রের সকল কর্মীদের মাসিক ন্যূনতম বেতন ২৮,০০০ টাকা করতে হবে। এ ছাড়া তাঁরা শ্রমিক স্বার্থবিরোধী সমস্ত পদক্ষেপ ও কালাকানুন বাতিল করার দাবিও জানান।

শাহিনবাগ ৮ মার্চকে এক নতুন মাত্রা দিল

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। বিশ্বের সমস্ত সচেতন নারীর কাছে এই দিনটি অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক সমানাধিকার অর্জনের দাবিতে শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দিন। এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে ঘোষণার পিছনে রয়েছে নারীদের দীর্ঘ আন্দোলন, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাস। নারী স্বাধীনতা, সমকাজে সমমজুরি, নারীর সার্বিক নিরাপত্তা, ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি আজও অপূরিত। এ সমস্ত কিছুর মধ্যেও এ বারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের তাৎপর্য আলাদা। এ বারের ৮ মার্চ এসেছে এমন সময়ে, যখন মানুষের নাগরিক অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে সারা দেশকে পথ দেখাচ্ছেন মহিলারা। দিল্লির শাহিনবাগ সারা দেশের কাছে আন্দোলনের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। দেশের নানা প্রান্তে গড়ে উঠেছে হাজারো 'শাহিনবাগ'।

দিনের পর দিন যে মহিলারা বাড়ির অন্দরমহলে রান্না-খাওয়া, সন্তান মানুষ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন, যাঁদের অনেকেই আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে ছাড়া কখনও বাড়ির বাইরে পা পর্যন্ত দিতেন না, বাইরের জগৎটা যাঁদের কাছে ছিল সম্পূর্ণই অচেনা, সেই চেনা ছন্দ ভেঙে আন্দোলনের ময়দানে তাঁরা শুধু সামিলই হননি, নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এ বারের ৮ মার্চ সেই অর্থে এক নতুন মাত্রা পেয়েছে।

১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ আমেরিকার সুতোকলের মহিলা শ্রমিকরা কাজের সময় কমানো, ন্যায্য মজুরি সহ নানা দাবিতে আন্দোলনে নেমেছিলেন। পুলিশ গুলি চালিয়ে রক্তাক্ত করেছিল রাজপথ। রক্তে রাঙা সেই পথ বেয়েই বিশ্বের দেশে দেশে নানা দাবিতে চলতে থাকে নারী আন্দোলন। ১৯১০ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলন ও নারী আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী ক্লারা জেটকিন ৮ মার্চ দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' হিসাবে ঘোষণা করার দাবি জানান। ১৭টি দেশের ১০০ জন মহিলা প্রতিনিধির সমর্থনে সেই দাবি গৃহীত হয়। প্রথম দিকে নারীদিবস মূলত নারীর ভোটাধিকার এবং নাগরিক অধিকারের আন্দোলন ছিল। পরে তা সামাজিক বঞ্চনা থেকে নারীর মুক্তি আন্দোলনে পরিণত হয়।

নারী-পুরুষের মজুরি বৈষম্য আজও অটুট। ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় ভেদে মানুষের উপর চলছে নিপীড়ন-শোষণ। মহিলাদের উপর নির্যাতনের ঘটনায় আজ এ দেশ প্রথম সারিতে, শিশুকন্যা থেকে বৃদ্ধা পর্যন্ত পাশবিক লালসার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। পরিবারে কিংবা কর্মস্থলে যৌন নিগ্রহ, নিরাপত্তাহীনতা, অসম্মান অহরহ ঘটে চলেছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, নারী ও শিশুপাচারে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম। পণের জন্য বধূহত্যা, অনার কিলিং, অ্যাসিড আক্রমণ, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, হত্যা ঘটেই চলেছে প্রতিদিন। বেড়ে চলেছে মদ ও মাদকের ব্যবসা। জুয়া-সাট্টার ঠেক পাড়ায় পাড়ায়। মোবাইল, ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী পর্নোগ্রাফি। শুধু যুবকরা নয়, কিশোর-কিশোরীরাও এতে বুঁদ হয়ে পড়ছে। নষ্ট হচ্ছে শিক্ষা-মূল্যবোধ-নৈতিকতার ভিত্তিমূল। এর বিষময় প্রভাব পড়ছে নারী সমাজের উপর, বিপথে যাওয়া যুবক-কিশোরদের লালসার শিকার হচ্ছেন তাঁরা। অন্ধ আবেগ, দারিদ্র ও আর্থিক প্রলোভনে কিশোরীরা পাচার হয়ে যাচ্ছে। সমাজের চরম অবক্ষয়ের মধ্যে এ সব যেন গা-সওয়া হয়ে আসছে।

পুঁজিপতিদের অর্থপুষ্ট শাসক দলগুলি এ সব অবাধে চলতে দিচ্ছে। সমাজ জুড়ে সীমাহীন শোষণকে কেন্দ্র করে মানুষের মনে যে ক্ষোভ বারুদের মতো জমা হচ্ছে, তা যাতে সংগঠিত বিক্ষোভ-আন্দোলনের আকারে ফেটে পড়তে না পারে, সেজন্য তাদের অসামাজিক কাজে লিপ্ত রাখার পরিকল্পিত আয়োজন চলছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে শাসক দলগুলির নেতাদের পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব। মহিলাদের সম্পর্কে তাঁদের ক্রমাগত কুৎসিত মন্তব্য দুষ্কৃতীদের এই ধরনের অপরাধে আরও উৎসাহিত করছে। একচেটিয়া পুঁজির সংস্থাগুলি পণ্যের বিক্রি বাড়াতে নারীদেহকে বিজ্ঞাপনে কাজে লাগাচ্ছে।

অন্যদিকে কেন্দ্রের শাসক বিজেপি দল এনআরসি-সিএএ-এনপিআরের মাধ্যমে দেশের মানুষের নাগরিক অধিকার হরণ করতে চাইছে এবং তাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিচ্ছে। এর মাধ্যমে ধর্মীয় বিভাজন এনে মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ বাড়িয়ে তুলছে। অর্থনৈতিক সংকটে জেরবার মানুষ, রুজি-রোজগারহীন মানুষ যখন কোনওরকমে পেট চালানোর জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করছেন, তখন জীবনের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ না করে সরকার তাঁদের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘোরাতে এই চরম বৈষম্যমূলক, সাম্প্রদায়িক আইন সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এর বিরুদ্ধে সর্বাগ্রে পথে নেমেছেন মহিলারা। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সামিল হয়েছেন এই আন্দোলনে। সরকার এই আইন প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন হিন্দু-মুসলিম-শিখ নির্বিশেষে আন্দোলনকারীরা।

এই আন্দোলন দেখিয়ে দিল এক ঐতিহাসিক সত্য। শোষিতের মধ্যে মহিলারাই বেশি শোষিত— তাই তাঁরা যখন লড়েন তার শক্তি ও প্রভাব শাসক শ্রেণির বুকে কাঁপন ধরায়। ৮ মার্চের মিছিলই রাশিয়ায় একদিন শোষণ উচ্ছেদের ডাক দিয়েছিল। অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের পরিপূরক করেই আজ নারীর মর্যাদা ও সুরক্ষার আন্দোলন করতে হবে। প্রয়োজন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রতি যে শোষণ-বৈষম্য-অবমাননা এই সমাজে চলছে, তার বিরুদ্ধেও সংগঠিত লড়াই।

মিড-ডে মিল কর্মীদের ন্যায্য বেতনের দাবি গোয়ালপোখরে

মিড-ডে মিল কর্মীরা মাত্র ১৫০০ টাকা মাসিক ভাতা পান। তাও আবার বছরে দু'মাস বন্ধ থাকে। প্রতিদিন রান্নার কাজ এবং সকাল ১০.৩০ টা থেকে ৩.৩০ থেকে পর্যন্ত স্কুলে কাজ করতে হয়। কিন্তু এই শ্রমের মূল্য দিচ্ছে না সরকার। এরই প্রতিবাদে উত্তর দিনাজপুরের ২৪ ফেব্রুয়ারি মিড-ডে মিল কর্মীদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা থেকে ২০ জনের কমিটি গঠিত হয়। ওই কর্মীদের সারা বছর সরকারের আইনানুযায়ী ন্যূনতম ২১ হাজার টাকা বেতনের দাবিতে আন্দোলনের অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের কোষাধ্যক্ষ শ্যামল রাম।

পুলিশিরাজের বিরুদ্ধে জৌনপুরে ধরনা

সাম্প্রদায়িক হিংসা বন্ধ, গণআন্দোলনে পুলিশি হস্তক্ষেপ বন্ধ, ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ, কৃষকদের সার-বীজ-কীটনাশক সরবরাহ ও চাকরির দাবিতে এবং এনআরসি-সিএএ-এনপিআর বাতিলের দাবিতে উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরে ৫ মার্চ জেলাশাসক দপ্তরে ধরনা কর্মসূচি পালিত হয়।

কাউপ্যাথি!

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার নবম খণ্ডে 'স্বামী-শিষ্য সংবাদ'-এ আছে, বিবেকানন্দ শিষ্যদের নিয়ে বসে আছেন এক স্থানে। সেখানে গোরক্ষণী সভার কয়েকজন প্রচারক চাঁদা চাইতে গিয়েছেন। বিবেকানন্দ তাঁদের কাছে 'উদ্দেশ্য' জানতে চাইলে তারা জানান— দেশের গোমাতাকে কসাইয়ের হাত থেকে রক্ষা করা। বিবেকানন্দ শুনে ওই প্রচারকদের জিজ্ঞসা করলেন, মধ্যভারতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে অসহায় মানুষে পাশে দাঁড়ানোর জন্য তাঁরা কিছু করেছেন কি না! প্রচারকরা জানান, দুর্ভিক্ষে সাহায্য করা তাঁদের কাজ নয়, গোমাতাদের রক্ষা করাই তাঁদের প্রধান কাজ।

বিবেকানন্দ উত্তরে বলেছিলেন—"যে সভা-সমিতি মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে না, নিজের ভাই অনশনে মরছে দেখেও তার প্রাণরক্ষার জন্য একমুষ্ঠি অন্ন না দিয়ে পশুপক্ষী রক্ষার জন্য রাশি রাশি অন্ন বিতরণ করে, তাদের জন্য আমাদের সহানুভূতি নেই!" বিবেকানন্দের শ্লেষ আছড়ে পড়েছিল— 'এমন মাতা না হলে এসব সন্তান প্রসব করেছেন কে?'

আধুনিক গো-রক্ষকরা বিবেকানন্দের এই বক্তব্য জানেন কি? যে বেদনা থেকে তাঁর এই মন্তব্য, তা উপলব্ধি করছেন কি? বর্তমান ভারত বিশ্বের ক্ষুধার্ত ১১৯টি দেশের মধ্যে ১০৩ নম্বরে, প্রতিদিন যেখানে ৭ হাজার মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যায়, যেখানে প্রতিদিন ২৩ কোটি মানুষ ক্ষুধার্ত থাকে। অথচ কেন্দ্রের ক্ষমতায় আসীন নেতারা এর প্রতিকারে কোনও চেষ্টা না করে হিন্দুত্ববাদের জিগির তুলে গো-রক্ষা সাধনায় মেতেছে।

তবে সব গরুর প্রতি তাদের সমদৃষ্টি নেই। এখানেও বিভাজনের রাজনীতি। তাদের পক্ষপাতিত্ব শুধু দেশজ গরুর প্রতি। এখন বিজেপি উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সব কেন্দ্রগুলিতে দলীয় প্রভাব বিস্তার করেছে। এই রকম একটি সংস্থা দ্য ডিপার্টমেন্ট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (ডিএসটি)-কে দিয়ে তারা প্রস্তাব করিয়েছে, দেশীয় গরু এবং তার থেকে প্রাপ্ত দ্রব্যগুলির বিশেষ গুণের উপর গবেষণায় জোর দিতে হবে। প্রস্তাবের মুখবন্ধে বলা হয়েছে বিভিন্ন রোগ যেমন ক্যানসার, ডায়াবেটিস, লিউকোডার্মা, আর্থারাইটিস চিকিৎসার ক্ষেত্রে দেশি গরু থেকে প্রাপ্ত দ্রব্যের কার্যকারিতা কতটা রয়েছে তা নিয়ে গবেষণা করতে হবে। যে পাঁচটি বিষয়ে গবেষণা করতে বলা হয়েছে, সেগুলি হল—দেশীয় গরুর স্বতন্ত্রতা, ঔষধ ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে গো-দ্রব্যের প্রয়োগ, কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ, খাদ্য ও পুষ্টিতে গো-দ্রব্যের ভূমিকা, গরুর জাত সংক্রান্ত আলোচনা।

কেন্দ্রীয় সরকারের ডিএসটি মন্ত্রক দাবি করেছে প্রাচীন আর্যুবেদিক সাহিত্যে দেশীয় গরু জাত দ্রব্যের ভেষজ গুণাবলির কথা নাকি বলা হয়েছে যা এই সমস্ত রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে কাজে লাগত। প্রশ্ন হল, ক্যানসার, ডায়াবেটিস, আর্থারাইটিসের মতো আধুনিক রোগের নাম কি প্রাচীন আর্যুবেদ শাস্ত্রে বর্ণিত ছিল? ইতিহাস বলে, না, তা জানা ছিল না।

যখন সারা দেশে মৌলিক গবেষণা অর্থের অভাবে ধুঁকছে, গবেষণায় অর্থবরাদ্দ বৃদ্ধির দাবিতে বৈজ্ঞানিকেরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সামিল হচ্ছেন তখন শুধুমাত্র 'বিশ্বাসের' উপর ভিত্তি করে এই ধরনের গবেষণার উদ্যোগ কেন? প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন দেশের বিজ্ঞানী মহল। ডিএসটির এই উদ্যোগকে ত্রুটিপূর্ণ এবং অবৈজ্ঞানিক বলে চিহ্নিত করে এই গবেষণার জন্য বরাদ্দ অর্থ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন দেশের ১১০ জনের বেশি বিজ্ঞানী।

তাঁরা লিখিতভাবে জানিয়েছেন—"এই প্রস্তাবটি ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতাকে ভীষণভাবে অধঃপতিত করবে, যেহেতু বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমাণ ছাড়াই কেবলমাত্র 'বিশ্বাসের' উপর নির্ভর করে এই গবেষণায় অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। বিজ্ঞান কখনও 'বিশ্বাস'-কে স্বীকৃতি দেয় না। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যে সত্য উদঘাটিত হয় তাকেই বিজ্ঞান গ্রহণ করে।

তা হলে এই 'কাউপ্যাথির' কী উদ্দেশ্য? আসলে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার বিজ্ঞান চর্চার জন্য সবচেয়ে বেশি যেটা প্রয়োজনীয়, সেই যুক্তিবাদী মননকে নানা ভাবে ধ্বংস করতে চাইছে। এমন সব বিষয়ে গবেষণার প্রস্তাব তারা দিচ্ছে যা শাসকদলের হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এতে বিজেপির হিন্দুত্ববাদী ভোটব্যাঙ্ক দৃঢ় হতে পারে, কিন্তু চরম ক্ষতি হবে বিজ্ঞানের, ক্ষতি হবে মানবসভ্যতার।

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

(৩২)

বর্তমান প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগর

আজ থেকে প্রায় একশো সত্তর বছর আগে, দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে বিদ্যাসাগর যে সামাজিক আন্দোলন শুরু করেছিলেন, ১৯৪৭-এর পর থেকে বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা ধীরে ধীরে কার্যত সে আন্দোলনকে পরিত্যাগ করেছে। বিদ্যাসাগরের মতো নবজাগরণের মনীষীদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং কঠিন সংগ্রামের ফলে যেটুকু যথার্থ শিক্ষাব্যবস্থার পরিকাঠামো এদেশে গড়ে উঠেছিল, নানা সময়ে নানা দলের সরকারি উদ্যোগে সেই পরিকাঠামোকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে। যে কোনও জবরদখলমূলক অত্যাচারী শাসন ব্যবস্থার মতো 'স্বাধীন' ভারতেও বরাবরই শিক্ষাকে দেখা হচ্ছে নিছক পয়সা রোজগারের উপায় হিসাবে। ফলে, সমস্ত দিক থেকে সরকারগুলির এই জনবিরোধী কার্যকলাপের অনিবার্য পরিণতিও ভোগ করছে দেশ তথা দেশের সাধারণ শ্রমজীবী জনগণ।

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড বুরোর সংগৃহীত তথ্যের (২০১৯) বিশ্লেষণে এক ভয়ঙ্কর চিত্র সামনে এসেছে। সেই বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বর্তমান ভারতবর্ষে বিশেষ করে শিক্ষিত এবং উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা ব্যাপকভাবে বাড়ছে। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে, শিক্ষক অধ্যাপক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সরকারি অফিসার উকিল পুলিশ প্রমুখের একটা বড় অংশ, নিজেদের নানা ধরনের চাহিদা মেটাবার জন্য, প্রায় নির্বিচারে যে কোনও অপরাধমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছে। প্রতিদিনকার সংবাদপত্রেও এমন বহু ঘটনার উল্লেখ থাকে।

এ হেন প্রবণতার অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে সমাজতাত্ত্বিকরা বলছেন, শিক্ষিতদের একটা বড় অংশের মধ্যে নীতি-নৈতিকতা-মূল্যবোধ ও বিবেকবুদ্ধির অভাব এবং ভোগবাদ মারাত্মক হারে বাড়ছে। এই নীতিহীন অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধের ফলে একদিকে আর্থিক অপরাধ, কর্পোরেট জালিয়াতি, সাইবার ক্রাইম (যেমন, অন্যের এটিএম কার্ডের পাসওয়ার্ড চুরি করা) ইত্যাদি হু-হু করে বাড়ছে। তথাকথিত শিক্ষিত লোকেরাই এগুলি করছে। অন্যদিকে দৈনন্দিন জীবনে, কর্মক্ষেত্রে পারস্পরিক রেষারেষি, সম্পর্কের মধ্যে কুৎসিত প্রতিযোগিতা ইত্যাদিও বাড়ছে। এই অসুস্থ পরিবেশ-পরিস্থিতিতে লাগাতার ব্যর্থতা হতাশা বিশ্বাসঘাতকতার কবল থেকে কোনও মতে পালিয়ে বাঁচার জন্য শিক্ষিত সমাজের বড় অংশের মধ্যে পৈশাচিক উল্লাসের প্রতিও আকর্ষণ বাড়ছে। আনন্দ উপভোগ বা অবসর বিনোদনের নামে তারা যেসব পন্থা অবলম্বন করছে তাতে মনে হয় যেন প্রকারান্তরে নিজেদের মানব অস্তিত্বকেই ধিক্কার জানাতে চায় তারা। মারাত্মক নেশাসক্তি, বিকৃত যৌনতার দাসত্ব ইত্যাদি তাদের অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে ধরেছে।

শুধু কি তাই? ধর্ম-বর্ণ-জাতি-উপজাতিতে আজও শতছিন্ন ভারতবর্ষের সমাজ। এখনও শাসকশ্রেণির অতি অল্প উস্কানিতেই সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত সাপ ছোবল মেরে শেষ করে দেয় সাধারণ জনজীবনকে। এই অপরাধপ্রবণ সমাজকে সুস্থ করার, এক মানবদেহের মতো দাঁড় করাবার আকাঙ্ক্ষায়, শাস্ত্রীয় অন্ধতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, সকল সাধারণ মানুষের জন্য আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা চেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। সেই শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা কুসংস্কারমুক্ত মানবতাবাদী মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, "ভারতবর্ষীয় সর্বসাধারণ লোক বিদ্যানুশীলনের ফলভোগী না হইলে তাহাদিগের চিত্তক্ষেত্র হইতে চিরপ্ররূঢ় কুসংস্কারের সমূলে উন্মূলন হইবে না।" বিদ্যাসাগর এও চেয়েছিলেন যে, শিক্ষাব্যবস্থাকে অবশ্যই হতে হবে ধর্মনিরপেক্ষ। তিনি লিখেছিলেন, "শিক্ষার্থীদের ধর্মের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে কোনও অনধিকার চর্চা করা শিক্ষকদের পক্ষে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ।" দেশের মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের জন্য 'কান্টিভেশন অফ সায়েন্স' প্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য বিদ্যাসাগর অর্থ সহ আরও নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন।

এই ইতিহাস, এই অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে আছে। কিন্তু তাকে গুরুত্ব না দিয়ে, বরং ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। বর্তমান ভারতের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদি নিয়মিত হয় শুধু না, এমনকি সিলেবাসের মাধ্যমেও নানা ভাবে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়ানো হয়। এর ফলে, আধুনিক মন, যুক্তিনিষ্ঠ মন গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। মানুষ কেবল পোশাকে আধুনিক সাজছে, কিন্তু মন-মানসিকতার দিকে থেকে সে পড়ে আছে মান্ধাতা আমলের অন্ধতা, কুসংস্কারে। এ কারণেই তাদের অনেককে শাসকশ্রেণি মানবতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র পাশবিক শক্তি হিসাবে ব্যবহার করতে পারছে।

বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন ধর্মতন্ত্র সহ সমস্ত সামাজিক অবদমনকে উচ্ছেদ করে ভারতের নারীশক্তির উত্থান। উনিশ শতকে মহিলাদের জন্য শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে গোটা দেশকে পথ দেখিয়েছিলেন তিনি। তাঁর পরিচর্যায় প্রাণ-পাওয়া বেথুন স্কুল এবং কলেজ লালন করেছে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, বীণা দাস প্রমুখের মতো শেকলছেঁড়া ব্যক্তিত্বের। অথচ, সেই ভারতের সাধারণ নারীসমাজ আজ চরম বিপন্ন, নিরাপত্তাহীন। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে সর্বত্র তাঁদের উপর চলছে অকথ্য অত্যাচার। আবার, তাঁদের মধ্যে একাংশ তথাকথিত শিক্ষিত নারী 'ব্যক্তি স্বাধীনতা'র নামে মারাত্মক বিভ্রান্তির শিকার। মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা নির্লজ্জভাবে তাঁদের বাজারের পণ্যে পরিণত করছে। এই ভারতকে দেখলে বিদ্যাসাগর কতটা যন্ত্রণা পেতেন, আমরা ক'জন তা উপলব্ধি করতে পারি?

ফলে, শুধু মহাপুরুষ হিসাবে অনুষ্ঠান নয়। বিদ্যাসাগর যে অর্থে ভারতে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার রূপকার ছিলেন, তা উপলব্ধি করা দরকার। যে অর্থে তিনি পার্থিব মানবতাবাদী মূল্যবোধের ধারক ছিলেন, তা আয়ত্ত করার চেষ্টা করা দরকার। জীবনে সামাজিক প্রয়োজনীয়তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন তিনি। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে চাইলে, সহজেই তা পারতেন। কিন্তু আত্মমর্যাদাহীন সেই পথে তিনি কখনও যাননি। শতবার আহত হয়েও সমাজের উদ্দেশে কাজ করে যাওয়ার কথা ভুলতে পারেননি। এই চরিত্র থেকে শিক্ষা নেওয়া দরকার। না হলে, অনেক অনুষ্ঠান হলেও দেশের জনজীবনের সার্বিক দুরবস্থা দূর হবে না। বিদ্যাসাগরের কাঙ্ক্ষিত সমাজ, যথার্থ শিক্ষিত সুস্থ সুন্দর সমাজ আমরা কোনও দিন পাব না। (চলবে)

বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা বিপন্ন প্রশ্ন নিরপেক্ষতা নিয়েও

দেশের বিচারব্যবস্থা নিয়ে সাম্প্রতিক কালে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই লেখাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে

(২)

সাম্প্রতিক আরও কিছু প্রশ্ন

কাশ্মীরের মানুষের উপর সরকার যেভাবে নানা দমনমূলক ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছে, তার প্রতিকারের আশায় একের পর এক মামলা সুপ্রিম কোর্টে এসেছে। ৩৭০ ধারা বাতিল সাংবিধানিক কি না, এ বিষয়ে অনেকগুলি মামলা হয়েছে। অথচ ৭ মাসের বেশি সময় ধরে সুপ্রিম কোর্টে তার শুনানিই হয়নি! তিনজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সহ প্রায় ৪০০ জনের বিরুদ্ধে বিনাবিচারে আটক রাখার পিএসএ আইন প্রয়োগ করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলা কাশ্মীরের প্রশাসন। ৫ হাজারের বেশি মানুষ মাসের পর মাস বিনা বিচারে বন্দি। জম্মু-কাশ্মীর হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট সেই সব মামলা দ্রুত শোনার কোনও আগ্রহই দেখাচ্ছে না। আদালতের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে শবরীমালা মন্দিরের মামলা। কাশ্মীরের প্রশ্নে হেবিয়াস করপাস মামলাতেও সুপ্রিম কোর্ট অত্যন্ত নরম ভূমিকা নিয়েছে। কাশ্মীরের প্রাক্তন বিধায়ক ইউসুফ তারিগামিকে বেআইনিভাবে আটক রাখার বিরুদ্ধে করা হেবিয়াস করপাস মামলায় আবেদনকারীর অধিকার মেনে তাঁকে আদালতে হাজির করতে পুলিশকে নির্দেশ দেয়নি আদালত। বদলে তাঁর দলের সাধারণ সম্পাদককে পুলিশি পাহারায় এবং মুখ বুজে থাকার শর্তে একদিনের জন্য কাশ্মীরে গিয়ে দেখা করার অনুমতি দিয়েছে মাত্র।

২০১৯-এর নভেম্বর মাসে এক সপ্তাহে চারটি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠেছে। একদিকে আদালত আপাতভাবে আইন ও নিরপেক্ষ বিচারের কথা বলেছে, কিছু ক্ষেত্রে বিজেপি সরকারের সমালোচনাও করেছে, অথচ দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় শাসক দলই মুচকি হাসছে। এমনিতেই ২০১৪ থেকে বিজেপি কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির সর্বব্যাপক দাপট দেখা যাচ্ছে। বিজেপি নানা রাজ্যে ক্ষমতা দখলের জন্য নীতি-নৈতিকতার বালাইটুকুও রাখছে না। এই পরিস্থিতিতে পরপর এই মামলাগুলির রায় বহু মানুষকে ভাবিয়েছে। প্রথমত, ৯ নভেম্বর ২০১৯ রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদের মামলায় সর্বোচ্চ আদালত হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস এবং পৌরাণিক কাহিনীকেই সব কিছুর উপরে বসিয়ে দিয়েছে। পাঁচ বিচারপতির মধ্যে কোনও একজন সংযোজনী হিসাবে রাম মাহাত্ম্যের বর্ণনা করেছেন (মূল রায় এবং সংযোজনীর লেখকের নাম আদালত জানায়নি), যা আদালতের বিচারপ্রক্রিয়ার অংশ হতে পারে না। অন্যদিকে আদালত ১৯৯৪ সালে দেওয়া সুপ্রিম কোর্টেরই দেওয়া রায়কে লঙ্ঘন করে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকে জমির মালিকানা সংক্রান্ত মামলায় টেনে এনেছে। একই সাথে মেনে নিয়েছে মসজিদের সংলগ্ন জমিতে কিছু পুরনো স্থাপত্যের চিহ্ন থাকলেও তা যে হিন্দু মন্দিরই ছিল তা নিশ্চিত নয়। আদালত আরও মেনে নিয়েছে ১৯৪৯ সালে গোপনে মসজিদের মধ্যে মূর্তি বসিয়ে দিয়ে আসা এবং ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ভাঙা, দুটিই বেআইনি এবং অন্যায় কাজ হয়েছে। কিন্তু তারপরেও রামভক্তদের বিশ্বাসের কথা বলে ওই ভাঙা মসজিদের জমিতেই মন্দির গড়ার জন্য কেন্দ্রকে ট্রাস্ট গড়ে দিতে বলেছে। ভারসাম্যের কারণ দেখিয়ে মুসলিমদের অন্য কোনও জায়গায় ৫ একর জমি দিয়ে ক্ষোভ চাপা দিতে চেয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের একটা অংশের বিশ্বাসই কি সব কিছুর উর্ধ্বে? প্রশ্ন উঠছে, বাবরি মসজিদ ভাঙা না হলে কি আদালত রায় দিত যে, মসজিদ ভেঙেই মন্দির গড়া হোক (ফ্রন্টলাইন, ৬ ডিসেম্বর ২০১৯)?

লক্ষণীয়, কেন্দ্রীয় শাসক দলের একাধিক নেতা এমনকি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যন্ত বলে বেড়াচ্ছেন, বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকারে থাকাতেই এই রায় সম্ভব হয়েছে (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২২ নভেম্বর ২০১৯)। আর একটি রায়ে সুপ্রিম কোর্ট রাফাল মামলায় দুর্নীতি হয়েছে কিনা তার বিচার করতেই রাজি হয়নি। যদিও বিচারপতি জোসেফ কুরিয়ান তাঁর আলাদা রায়ে বলেছেন, চাইলে সিবিআই বা কোনও তদন্তকারী সংস্থা রাফাল বিমানের দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে তদন্ত করতেই পারে। আদালতের রায় তাতে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। কিন্তু এমনিতেই সরকারের খাঁচার তোতা বলে পরিচিত সিবিআই সরকারের সর্বোচ্চ স্তরের বিরুদ্ধে তদন্ত করবে, আজকের ভারতে সে আশা বৃথা। ফলে সুবিধা দেখছে বিজেপি। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল, বিচারপতি জোসেফ কুরিয়ানের সুপ্রিম কোর্টে নিয়োগ আটকাতে বহু চেষ্টা করেছিল বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার।

তৃতীয় ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট তার আগেকার অবস্থান থেকে সরে এসে শবরিমালা মন্দিরে ১২ থেকে ৫০ বছর পর্যন্ত মহিলাদের ঢোকার পক্ষে রায় পুনর্বিবেচনার জন্য সাত বিচারপতির বৃহত্তর বেঞ্চ গঠন করার কথা বলেছে। একই সাথে সেই বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে তারা মুসলিম, পারসি, দাউদি বোহরাদের মতো ধর্মে নারীর অধিকারের প্রশ্নও বিচার করবে। হিন্দু ধর্ম সংক্রান্ত বিতর্কের মামলায় অন্য ধর্ম সম্প্রদায়কে টেনে আনাকে এই সম্প্রদায়গুলির বহু মানুষ অযৌক্তিক বলে মনে করছেন। যদিও এতে হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলি যথেষ্ট উৎসাহিত।

আটের পাতায় দেখুন

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

গণহত্যার প্রতিবাদ দিল্লিতে

গণতান্ত্রিক অধিকার ও ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার লক্ষ্যে ৫ মার্চ যন্তরমন্তরে অল ইন্ডিয়া ডিএসও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ধরনার আয়োজন করে। বক্তব্য রাখেন জেএনইউ-র অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক চমন লাল, প্রখ্যাত কবি ও সমাজকর্মী গওহর রাজা, সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ, জেএনইউ-র সেন্টার ফর দি স্টাডি অব ল অ্যান্ড গভর্ন্যান্স-এর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডঃ ঘাজালা জামিল, এস ইউ সি আই (সি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড প্রতাপ সামল, এ আই ডি এস ও-র সর্বভারতীয় সহসভাপতি কমরেড অশোক মিশ্র এবং সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ। সভাপতিত্ব করেন সর্বভারতীয় কমিটির সভাপতি কমরেড ভি এন রাজাশেখর।

দিল্লিতে যে গণহত্যা বিজেপি-আরএসএস ঘটালো, তার তীব্র নিন্দা করে বক্তারা সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে পরাস্ত করা এবং সিএএ-এনআরসি-এনপিআরের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্রতর করার আহ্বান জানান।

স্বাধীনতা সংগ্রামীও বিজেপির চোখে পাকিস্তানের দালাল

প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী কর্ণাটকের এইচ এস ডোরেস্বামীকে পাকিস্তানের দালাল বলে দেগে দিতে বাধল না বিজেপি বিধায়কের। ওই স্বাধীনতা সংগ্রামীর অপরাধ উনি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও এনআরসি বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন।

এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বিজেপি বিধায়ক বসনাগৌড়া পাটিল ইয়াতনাল ১০১ বছর বয়সী এই স্বাধীনতা সংগ্রামীকে ভুয়ো স্বাধীনতা সংগ্রামী বলেও কটাক্ষ করলেন। এটা শুধু বসনাগৌড়ার বিচ্ছিন্ন বক্তব্য নয়, তাঁকে সমর্থন জানান বেলারির বিজেপি বিধায়ক সোমশেখর রেড্ডি। এই নীচ এবং হীন মন্তব্যের প্রতিবাদে ৫ মার্চ বেঙ্গালুরুতে বিক্ষোভ দেখায় ডিএসও, ডিওয়াইও, এমএসএস এবং সেভ এডুকেশন কমিটি। সেখানে আমন্ত্রিত হয়ে বক্তব্য রাখেন ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহ, কৃষক নেতা চামরাসা পাতিল, এস ইউ সি আই (সি) বেঙ্গালুরু জেলা সম্পাদক কমরেড এম এন শ্রীরাম, কমরেডস মাভাল্লি শঙ্কর, শোভা এস, অজয় কামাথ, বিনয় সারথি, ডাঃ রাজাশেখর প্রমুখ।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বেঙ্গালুরুতে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে হওয়া নানা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছেন ডোরেস্বামী। বেঙ্গালুরুতে তিনি অনশনেও বসেছিলেন। ডোরেস্বামী তরুণ বয়সে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে তিনি তাঁর অবদান রাখেন। স্পষ্টবাদী মানুষ তিনি। বিজেপি, কংগ্রেস, জেডিএস সহ সকল সরকারের জনবিরোধী কাজের প্রতিবাদ তিনি বলিষ্ঠভাবে করেছেন। দাঁড়িয়েছেন সকল অন্যায়ের প্রতিবাদে। এ হেন মানুষটিকে ভুয়ো স্বাধীনতা সংগ্রামী বললেন সেই দলের বিধায়ক, যে দলের পূর্বসূরিরা ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছিলেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করে গেছেন।

বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা

সাতের পাতার পর

চতুর্থ মামলাটিতে কর্ণাটকের ১৭ জন এমএলএ-র সদস্যপদ বাতিলের জন্য স্পিকারের সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে জানিয়েও সর্বোচ্চ আদালত তাদের ভোটে লড়ার অনুমতি দেয়। তারপরেই তাদের ১২ জনই বিজেপির হয়ে উপনির্বাচনে জিতেও যান। অথচ কর্ণাটকে কংগ্রেস-জেডিএস কোয়ালিশন ভাঙতে যে টাকার খেলা হয়েছে তা আজ কারও অজানা নয়। বিজেপি এদের অনেক টাকার বিনিময়ে এবং মন্ত্রীত্বের প্রলোভন দিয়ে কিনেছিল বলে সমস্ত সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে। এই কেনাবেচার পিছনে কাজ করেছে খনি মাফিয়াদের টাকার থলি। এই এমএলএরাও তা পুরোপুরি অস্বীকার করেননি। কিন্তু অনৈতিক কার্যকলাপের জন্য স্পিকার বর্তমান বিধানসভার পূর্ণ মেয়াদ পর্যন্ত এই ১৭ এমএলএ-র সদস্যপদ খারিজ করে দেওয়ায় বিজেপি এদের মন্ত্রী বানাতে পারেনি। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তাদের সে বাধা দূর হয়েছে। একদিকে সর্বোচ্চ আদালত স্পিকারের সিদ্ধান্ত এবং নৈতিকতাকে মান্যতা দিল, অন্যদিকে বিজেপি যা চাইছিল তাই হতে পারল একই রায়ে (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১৭ নভেম্বর ২০১৯)।

২৭ বছরেও বাবরি মসজিদ ভাঙার কোনও শাস্তি হল না

১৯৯২ সাল থেকে চলছে বাবরি মসজিদ ভাঙার মামলা। ৪০০ বছরের পুরনো একটি 'হেরিটেজ' স্থাপত্য ভাঙার শাস্তি ভারতীয় দণ্ডবিধিতে যথেষ্ট কড়া। কিন্তু সে আইন প্রয়োগ করবে কে? বিজেপি সরকার তো করবেই না, হিন্দু ভোটব্যাঙ্কে ক্ষতির আশঙ্কায় কংগ্রেসও তা করেনি। এই মামলার অন্যতম আসামী লালকৃষ্ণ আদবানি, মুরলি মনোহর যোশী, উমা ভারতী, অটল বিহারি বাজপেয়ী, অশোক সিঙ্ঘল সহ আরও সব তাবড় সংঘপরিবার-বিজেপি নেতা। লিবেরহান কমিশন সুস্পষ্টভাবে বাবরি মসজিদ ধ্বংসকে একটি পরিকল্পিত ঘটনা এবং এর ধ্বংসের জন্য এই নেতাদের দায়ী করা সত্ত্বেও নিম্ন আদালত সকলকেই বেকসুর খালাস করে দেয়। হাইকোর্টও এই রায় বজায় রাখে। সাধারণত কোনও একটি জমি নিয়ে ফৌজদারি এবং দেওয়ানি মামলা চললে ফৌজদারি মামলার বিচার আগে হয়। কিন্তু ফৌজদারি বিচারের আগেই সুপ্রিম কোর্টের রায়ে জমির অধিকার পেয়ে গেল যারা, অভিযুক্ত তারাই। ফলে এই মামলার আর কোনও মানেই থাকল না। সুপ্রিম কোর্ট যদিও বলে দিয়েছে ২০২০ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে এই মামলার নিষ্পত্তি করতে হবে। কিন্তু ২১ জন আসামীর ৮ জন এখন মৃত। আদবানির বয়স ৯২। অন্যদেরও যথেষ্ট বয়স হয়েছে। ফলে এঁদের জীবৎকালে এই মামলার ফয়সলার আশা করছেন না কেউই।

সোহরাবুদ্দিন ভুয়ো সংঘর্ষ মামলা

২০০৫-'০৬ সালের গুজরাট পুলিশের হাতে ভুয়ো সংঘর্ষে নিহত হয়েছিলেন শেখ সোহরাবুদ্দিন, তাঁর স্ত্রী কওশর বাই এবং তুলসিরাম প্রজাপতি। ২০১৮ সালে সেই মামলার রায় দিতে গিয়ে বিচারপতি এস জে শর্মাকে বলতে হয়েছে, এর স্বপক্ষে প্রায় কোনও প্রমাণই তদন্তকারীরা পেশ করেনি। সব বুঝেও অপরাধীদের শাস্তি দিতে না পারার যন্ত্রণায় বিচারককে বলতে হয়েছিল, 'সোহরাবুদ্দিন শেখ এবং তুলসিরাম প্রজাপতির পরিবার, বিশেষত তার মা নর্মদাবাইয়ের জন্য আমি গভীর দুঃখ অনুভব করছি' (দ্য ওয়্যার ২৯.১২.১৮)। অথচ সিবিআই তাদের চার্জশিটে এই হত্যাকাণ্ডকে ভুয়ো সংঘর্ষে খুন বলেই স্বীকার করেছে। এমনকি গুজরাট পুলিশের প্রায় দশজন অফিসার এবং সেই সময় বিজেপির রাজ্য সরকারের এক প্রভাবশালী মন্ত্রী জেলেও গিয়েছিলেন। কিন্তু চিত্রটা বদলে যায় ২০১৪ সালের মে মাসে বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতা দখলের পর।

২০ জুন ২০১৪ ছিল বিজেপির ক্ষমতা-কেন্দ্রের দ্বিতীয় ব্যক্তিটির আদালতে সশরীরে হাজিরার দিন। কিন্তু তিনি কোনও কারণ না দেখিয়েই হাজিরা দেননি। বিচারপতি উটপট এতে উষ্মা প্রকাশ করে ২৬ জুন তাঁকে হাজিরা দিতেই হবে বলে কড়া নির্দেশ দেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে ২৫ জুন বিচারপতি উটপটকে পুনায় বদলি করে দেওয়া হয়। অথচ ২০১২ সালে সর্বোচ্চ আদালত এই মামলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই বিচারককে বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছিল। পরবর্তী বিচারক বিএইচ লোয়া দায়িত্ব নিয়েই এই মামলায় আগের বিচারকের মতোই কড়া অবস্থান নিয়ে বিজেপির সেই প্রভাবশালী নেতাকে হাজিরা দিতেই হবে বলে নির্দেশ দেন। ১৫ ডিসেম্বর সেই হাজিরার দিন ঠিক হয়। কিন্তু ১ ডিসেম্বর বিচারপতি লোয়ার আকস্মিক এবং রহস্যজনক মৃত্যু ঘটে। তাঁর পরিবার এই মৃত্যু স্বাভাবিক নয় বলে দাবি করে। বিচারপতি লোয়ার বোন অভিযোগ করেন, বোম্বে হাইকোর্টের এক বিচারপতির মাধ্যমে বিচারপতি লোয়াকে এই মামলা মিটিয়ে নিতে ১০০ কোটি টাকা ঘুষের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। মৃত্যুর সাতদিন আগে বিচারপতি লোয়া পরিবারের সদস্যদের কাছে এই ঘটনাটি বলে তাঁর জীবনের আশঙ্কা আছে বলে উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর বাবাও একই অভিযোগ তুলছিলেন (ক্যারাভান পত্রিকা, ২১.১১.২০১৭)। এই ঘটনার যথাযথ তদন্ত হয়নি। বিচারপতি লোয়ার মৃত্যুর ঘটনায় কোনও অস্বাভাবিকতা নেই বলে রায় দিয়েছিলেন যে বিচারপতি, তাঁকে অতি দ্রুত সুপ্রিম কোর্টে প্রোমোশন দিতে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগী হয় (এনডি টিভি ২৭.১০.২০১৭ এবং টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১০.০৫.২০১৯)। বিচারপতি লোয়ার জায়গায় যাঁকে বসানো হয়, সেই বিচারপতি গোসাভি বিজেপির সেই প্রভাবশালী মন্ত্রী সহ সমস্ত অভিযুক্তকে নিঃশর্তে মুক্তি দিয়ে দেন। চার্জশিট হয়ে যাওয়ার পরেও কোনও প্রমাণ দাখিল এবং শুনানি ছাড়াই একতরফা ভাবে সবার মুক্তি মিলে যায় (দ্য স্ক্রোল, ২৯.১২.২০১৮)। পরবর্তী বিচারক এস জে শর্মার সামনে এই মামলার ইতি টানা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। যা দেখে এই মামলার তদন্তকারী অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার ভিএল সোলাঙ্কি বলেছিলেন, 'ভারতে কোনও বিচার নেই'(দ্য ক্যারাভ্যান ম্যাগাজিন, ২১.০৯.২০১৮)। (চলবে)

মোটরভ্যান চালকদের আন্দোলনের জয়

হুগলি জেলায় ৩০ হাজারের বেশি গরিব মানুষ বাঁচার তাগিদে মোটর ভ্যান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। সম্প্রতি চন্দননগর পৌরনিগমের পুরকমিশনার নোটিশ জারি করেন— চন্দননগর এলাকায় মোটরভ্যান নিষিদ্ধ। ফলে শুরু হয় মোটরভ্যান ধরপাকড় এবং গাড়িচালকদের থেকে লিখিয়ে নেওয়া, তাঁরা মোটরভ্যান চালাবেন না। এর প্রতিবাদে ২৮ ফেব্রুয়ারি সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে চন্দননগর পৌরনিগমে ও থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। পাঁচশোরও বেশি মোটরভ্যান চালক শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেন। এসিপি চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের উপস্থিতিতে থানার আই সি-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। আন্দোলনের চাপে আটক গাড়িগুলি ছেড়ে দেওয়া হয় এবং মোটরভ্যান চালকরা তাঁদের অধিকার ফিরে পান।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com